# ইতিহাস কথা কয়

মুহম্মদ আবূ তালিব

# ইতিহাস কথা কয়

মুহম্মদ আবূ তালিব

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

# ইতিহাস কথা কয়

মুহম্মদ আবূ তালিব

**প্রকাশক ঃ**

**মোহাঃ বেনাউল ইসলাম**

ভাইস-চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

**ঢাকা অফিস ঃ**

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

**চট্টগ্রাম অফিস ঃ**

নিয়াজ মঞ্জিল, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

**স্বত্ব ঃ**

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

**প্রকাশ কাল ঃ**

**মে, ১৯৯৮**

**মুদ্রাকর ঃ**

বুক প্রমোশন প্রেস

২৮, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

**প্রচ্ছদ ঃ**

**পঙ্কজ পাঠক, রূপক গ্রাফিকস্**

**কম্পিউটার কম্পোজ ঃ**

বন্ধু কম্পিউটার্স

২৮/সি, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

**মূল্য ঃ ১০০ টাকা**

**প্রাপ্তিস্থান ঃ**

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

১৫০-১৫১, গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা।

নিয়াজ মঞ্জিল, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

---

ITIHAS KATHA KOY : Wirten by Mohammad Abu Talib, Published by : Mohd. Benaul Islam, Vice-Chairman, Bangladesh Co-Operative Book Society Ltd., 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price : Tk. 100.00, US$ 4.00

ISBN-984-493-035-9

# উপহার

আমার সদ্য বিলেত প্রত্যাগত দাদুভাই—
গৌরব ইশ্‌তিয়াকুর রহমান ওরফে গোরা ও
তার বোন গীতি তাজকিয়া সুলতানাকে আমার
'ইতিহাস কথা কয়' বইখানি উপহার দিলাম।
আশা করি, এ বই তাদের ভালো লাগবে।

ইতি–

দাদুভাই

মুহম্মদ আবূ তালিব

# প্রকাশকের কথা

রাজশাহী থেকে অধ্যাপক মুহাম্মদ আবূ তালিবের অচিন পাখি সংগ্রহশালার প্রথম অবদান "ইতিহাস কথা কয়, বাংলা সাহিত্যের শূন্য পুরাণ, একটি ব্যতিক্রমী প্রসঙ্গ" শীর্ষক গবেষণা প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে।

এই বিশ্লেষণধর্মী ও গবেষণামূলক গ্রন্থটি সম্পর্কে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'মাসিক পরওয়ানা'র মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। পত্রিকাটিতে বলা হয়েছে ঃ

"গবেষক মুহাম্মদ আবূ তালিবের আলোচ্য পুস্তিকায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জাতি সত্তার প্রকৃত মূল ধারাকে চিহ্নিত করেছেন। ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্যে পৌত্তলিকতার ভেড়িবাঁধ নির্মিত হয়েছে। যুগে যুগে এবং একত্ববাদী মূল স্রোতকে ঘোলাটে করতে ব্রাহ্মণ্য চিন্তা-চেতনার আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ তিনি রামাঞি পন্ডিতের শূন্য পুরাণ কাব্যকে বিশ্লেষণ করে উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। ব্রাহ্মণেরা ফতোয়া দিয়েছিল যে, মানব রচিত বাংলা ভাষায় রামজটাধারী রৌরব নরকে ভষ্মিভূত হবে। কাজেই মুহাম্মদ আবূ তালিবের এ পুস্তকটি সময়ের প্রেক্ষিতে খুবই উপযোগী।"

এই মন্তব্যের সারবত্তা বিস্তর; এর গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী ফলাফল বিস্তারে সহায়ক। এই নিরিখেই বইটি প্রকাশের উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি। ইসলাম আল্লাহর নির্দেশিত বিধানে সবচাইতে সেরা ধর্ম। এই ধর্মের বিরুদ্ধে ইহুদী, খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের চক্রান্ত যুগ যুগ ধরে পরিচালিত। চক্রান্তের কৌশল ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার মধ্যে অন্তর্নিহিত। এই চক্রান্ত অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে হলে তা এতোদিনে বিলুপ্ত হয়ে যেত। মহা পবিত্রতার স্বাক্ষর বয়ে ইসলাম অটুট, অজেয় ও অম্লান হয়ে স্বমহিমায় বিরাজিত এখনো, তখনো।

ইসলাম মহিমান্বিত আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও ইতিহাস খেকোরা ওত পেতে থেকে ঘাপটি মারার অপপ্রয়াস চালু রেখেছে। ইতিহাসের পরিচালিকা শক্তি ন্যস্ত ছিলো মুসলমানদের উপর। খেই হারিয়ে ফেলে মুসলমান এবং অন্তরালের মুখোশধারীরা বিভ্রম সৃষ্টি করেছে। বিভ্রম ইতিহাসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এটা মুসলমানদের গ্রাস করে নেবার আরেক ষড়যন্ত্র। এই রাহু গ্রাসের যাঁতাকলে পিষ্ট আজ মুসলমানেরা অষ্টপ্রহর।

যুব মানস দিশেহারা। এই দিশেহারাদের দিশা দেখিয়ে ষড়যন্ত্রের বলয় থেকে আলোর পথে নিয়ে আসবার জন্যেই মুহাম্মদ আবূ তালিবের প্রয়াস। ছায়ান্ধকার লীন করে দ্যুতি ও প্রভা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। যুব মানসে বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্নের জবাব তাঁর এই প্রয়াসে বর্তমান। "ইতিহাস কথা কয়" বইয়ে দেবে নতুন স্ফূরণের আমেজ, অমিত তেজ ও যুগান্তকারী বিক্রম।

ইতিমধ্যে মফস্বল শহর থেকে প্রচ্ছন্নভাবে খন্ডে খন্ডে পুস্তিকাকারে প্রকাশ পেয়েছে। উপলব্ধির যন্ত্রনা তাতে প্রদান করা সম্ভব হয়ে উঠেনি প্রকাশ সৌরভ সৃষ্টি করা যায়নি বলে।

আমরা খন্ডগুলো সংযোজন করেছি, একত্রিত করে গ্রন্থিভুক্ত করেছি 'ইতিহাস কথা কয়' শিরোনামে। তাই এই প্রকাশনার মহতি অভিলাষ। সঙ্গত কারণে আশা করছি, এটা মনোরম ভঙ্গিমায় আকর্ষণ করবে পাঠক/পাঠিকাদের। বিভ্রমের শিকার হতে কিছুটা হলেও তারা রেহাই পাবে।

আমরা এই জন্যে কিছু গর্ব ও গৌরব বহন করতে চাই। গ্রন্থটি সমাদৃত হলে আমরা খুশি। স্পন্দন সুগাথার জন্যে আল্লাহর কাছে শোকর গুজারী করছি। আল্লাহ হাফিজ।

**মোহাঃ বেনাউল ইসলাম**
ভাইস-চয়ারম্যান,
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

# লেখকের কথা

সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীকালব্যাপী কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা/ পঠন পাঠন কার্যে নিয়োজিত থেকে লক্ষ্য করেছি- যদিও সুদীর্ঘ আটশ' বৎসর কাল ধরে ভারত উপমহাদেশের দন্ডমুন্ডের কর্তা থাকলেও পরাধীন/ বৃটিশ ভারতে মুসলমানগণ হিন্দু সমাজেও নিগৃহীত ছিল। ইদানিং নাথ-সন্ধর্মিগণ হিন্দু সমাজে গৃহীত হলেও আজও জল অনাচরনীয়-নাথ-সন্ধর্মি মাত্র। পাশ্চাত্য দেশেও কি তাঁর ব্যতিক্রম? সে দেশে য়িহুদীগণ ভারতীয় হিন্দুদের মতই নিগৃহীত ছিল। জাতিভেদে অস্পৃশ্যতা জর্জরিত ভারত, সেই সঙ্গে বাংলাদেশ এই অস্পৃশ্যতার ছিদ্র পথে মুসলিমগণ পথিক থেকে শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। মাঝখানে ব্রাহ্মণ্যবাদী/ হিন্দু শাসকগণ হিন্দু ধর্ম পুনরুত্থানের নামে যে অস্পৃশ্যতা, কৌলিন্যবাদের দেয়াল গড়ে তুলেছিল বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে তারই পরিণতির কথা বলা হয়েছে। খালজ-বীর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খালজী মাত্র সতেরো জন অকুতোভয় মুসলিম সেনাদল সহযোগে গৌড় তথা বাংলাদেশ অধিকার করতে সক্ষম হন। বাঙালী হিন্দু ঐতিহাসিকগণ যাই বলুন না কেন, যদি সেদিন বাংলাদেশ মুসলমান কর্তৃক বিজিত না হতো, তাহলে অধুনা বাংলা-ভারতীয় সভ্যতারও আবির্ভাব হ'ত কিনা বলা শক্ত।

কৌতুহলের ব্যাপার, বখ্ত ইয়ার খালজীর বঙ্গ বিজয় কাহিনী নিয়ে বৌদ্ধ কবি দ্বিজ রামঞি পন্ডিত রচনা করেন তথা-কথিত শূন্য পুরাণ (আগম পুরান)। যার মূল বক্তব্য হ'ল মুসলিম বীর গাজী ইখ্তিইয়ার উদ্দিনের গৌড় বিজয়। গৌড় বিজয় শুধু রাজ্য বিজয় নয়, ভালো করে দেখতে গেলে তাকে বিশ্ব বিজয় বলতে হয়। আমাদের অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে, রামাঞি পন্ডিতের কাব্যখানিই এ যাবত প্রাপ্ত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য। বলাবাহুল্য, তৎকালে বঙ্গ-ভারতীয় উপমহাদেশে রামাঞির বাংলা কাব্য একাধারে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম কাব্য তো বটেই, উপরন্তু উপমহাদেশে পরবর্তী হিন্দী (হিন্দবি) উর্দু ইত্যাদি ভাষারও সে পথিকৃত।

উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় আদ্যকালে যে চর্যাপদ/ পদাবলী রয়েছে তারই মূলে রয়েছে এই বৌদ্ধবাদী সম্প্রদায়ের অবদান। চর্যাপদের পরেই আমরা শূন্য পুরাণ পাচ্ছি। এই শূন্য পুরাণের ভাষাই বিবর্তিত হয়ে তথাকথিত দোভাষী তথা 'জবান-ই-বাংলা' হয়ে অধুনা বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। যবন ও জবান দু'টি নামই বিকৃত। যবান/ জবান- ফারসী শব্দ, অর্থ- 'ভাষা'। দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙালী কবি ভারতচন্দ্র অজ্ঞতাবশতঃ ফারসী 'যবান' শবদকে 'যাবনী মিশাল' বলে ভুল করেছেন। 'জবানে বাঙগালা'/ বাঙলাই তার প্রকৃত নাম। বর্তমান বই-এ তার কথাঞ্চিত জবাব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমি জানিনা, আমার বক্তব্য স্থাপনে কতটা সফল হয়েছি। বইখানির একটি যুতসই নাম আমার মনে এলেও নানা কারণে তা থেকে বিরত রইলাম। পাঠক সমাজ এর বিশেষ নাম কল্পনা করতে পারেন, এ কারণে নামটি বর্জিত হ'ল।

উল্লেখ্য, বইখানি চারটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিভক্ত। তার মধ্যে প্রথমটি হলো "বাংলা সাহিত্যে শূন্য পুরাণ ঃ তার কাল ও ভাষা। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়গুলির যে নাম আছে তাই থাকবে। এ গুলির কোন নতুনত্ব নেই, শুধু একত্রে সংযোজিত হয়েছে মাত্র। তবে এগুলি ১, ২, ৩, ৪ এভাবে উল্লেখ করলে চলবে। এখন সুধী সমাজের সামান্যতম দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে কৃতার্থ হবো।

আমিন!

অচিন পাখি
১৪১/২ উপশহর আ/এ
সেনানিবাস, রাজশাহী।

**মুহম্মদ আবু তালিব**
২৮শে এপ্রিল, ১৯৯৮

## ইতিহাস কথা কয় ঃ

(৬০১ হিজরী/ ৬০১ বাংলা-১৪০১ বাংলা হিজরী/ ১৪০১ বাংলা) বখতইয়ারের বঙ্গ বিজয়- দক্ষিণ পশ্চিমে লাখনৌর (রাজনগর), উত্তর পূর্বে দেবকোর্ট, বীরভুম (গঙ্গারামপুর বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুর, ভারত) আট শত বৎসর পূর্ণ হল- ৬০০-১৪০১ বাংলা।

এখানেই তার সেনানিবাস ও মাজার অবস্থিত। নওদিয়া (নদীয়া) সাবেক রাজশাহী জেলার নবাবগঞ্জের অন্তর্গত নওদা তিনি আক্রমণ করে ধ্বংস করেন। নওদার বুরুজ এখনও বিদ্যমান। রংপুর (মাহিগঞ্জে তিনি ভবিষ্যতে রাজধানী করবার সংকল্প করেন। যথারীতি রাজধানী নির্মিত হয় কিন্তু অধিষ্ঠান হতে পারেনি।

(দ্রষ্টব্য ঃ তারিখই ফেরেস্তা নওলকিশোর প্রেস লাহোর, ১৯০৫। পৃষ্ঠা ২৯৩ লাইন ২২/২৬) যথা :-

"দরসারহাদে বাঙ্গালা দর ইউআজে শাহারে নওদিয়া শাহারে মওসুম বেরঙ্গ পুরে বেনা কারদা দারুল মুলক খুদসাতত।"

**আবূ তালিব**

উত্তর বঙ্গে সাহিত্য সাধনা

রাজশাহী, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ৪৭-৫২

# প্রথম খন্ডের ভূমিকা

বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতির কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নেই। সে ইতিহাস লেখার প্রচেষ্টাও কেউ করেছেন বলে মনে হয় না। কারণ, যা আছে তা নিতান্তই কাল্পনিক অস্পষ্ট ও অপ্রতুল। বিশেষ করে খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে সুদূর তুরস্কের খাল্‌জ প্রদেশের এক দূরাকাঙ্খা বীর যুবক মুহাম্মদ বিন বখত ইয়ার তার সতের জন ঘোড়-সওয়ার সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে যে একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করেন (৬০০ হি/ ১২০৩ খ্রীঃ অ), তারপর থেকে একটানাভাবে এ দেশে মুসলিম সালতানাত কায়েম হয় এবং অদ্যাবধি তারই ধারা জারী আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই বাংলা বিজয় ও নব গঠিত যে বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘটে, বাংলার ইতিহাসবিদ মনীষিগণ তা যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। এমন কি এ কাহিনী নিয়ে শূন্য পুরাণ সহ নানা উদ্ভট ও কাল্পনিক লোক কাহিনী (ফোকলোর) সৃষ্টি করে চলেছেন। সম্প্রতি তারই কিছু বিশ্বস্ত বিবরণী নিয়ে এ নিবন্ধের সূত্রপাত। এখন সুধী সমাজের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

মুহম্মদ আবু তালিব

(মুহম্মদ আবূ তালিব)

১০-০৫-৯৮

# সূচীপত্র


**প্রথম খন্ড ঃ বাংলা সাহিত্যে রামাঞি শূন্য পুরাণ একটি ব্যতিক্রমী প্রসঙ্গ**

- শূন্য পুরাণ-রামাঞি পন্ডিত ..... ১১
- সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ..... ১৬
- শূন্য পুরাণের ঐতিহাসিকতা ..... ১৬
- রামাঞি পন্ডিতের কাল ও ভাষা ..... ২১
- পরিশিষ্ট-১ ঃ নদীয়া কোথায়? ..... ২৬
- পরিশিষ্ট-২ ঃ রূপক ব্যাখ্যা ..... ৩৩
- পরিশিষ্ট-৩ ঃ যবনাতার ..... ৩৭

**দ্বিতীয় খন্ড ঃ মুসলমানী কথা (আল্লাহ বিশ্বাসীর উপহার)**

- প্রসঙ্গ কথা ..... ৪২
- ভূমিকা ..... ৪৩
- যুগে যুগে আল্লাহর দূত/নবী ..... ৪৪
- শেষ নবী প্রসঙ্গ ..... ৪৬
- বেদ পুরাণে মুসলমানী প্রসঙ্গ ..... ৪৭
- যব দ্বীপীয় মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বনাম হযরত মুসা ..... ৪৮
- ইসলামে কালিমা-কালাম প্রসঙ্গ ..... ৫০
- সৈয়দ সুলতান ও নবী বংশ প্রসঙ্গ ..... ৫২
- বাইবেল-কুরআনে বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ ..... ৫৩
- জলমগ্ন দ্বারকা ও শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ..... ৫৬
- মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন প্রসঙ্গ ..... ৫৯
- আল্লামা ইকবালের জাভিদনামা বনাম ডিভাইন কমিডি ..... ৬০
- সাম বেদ প্রসঙ্গ ওঁ/ব্যোম, বাঙ ইত্যাদি ..... ৬১
- বিসমিল্লাহ প্রসঙ্গ ..... ৬২
- মূল 'কালিমাহ' তৌহীদ প্রসঙ্গ ..... ৬৩
- বিশ্বকাল পঞ্জী/ কাল পরিচয় ..... ৬৩

**তৃতীয় খন্ড ঃ বিভ্রান্ত বাঙালী**

- বিভ্রান্ত বাঙালী ..... ৭১
- বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও জাতিতত্ত্বের কথা ..... ৭৫

**চতুর্থ খন্ড ঃ মানব জাতির সপক্ষে**

- মানব জাতির সপক্ষে ..... ৮৫
- ঈশ্বর 'আল্লাহ' তেরে নাম ..... ১১২
- আল কোরআনের দৃষ্টিতে মূর্তি পূজা ও অন্যান্য ধর্ম ..... ১২১
- রাম জন্মভূমি ঃ ভারতীয় অযোধ্যায় না থাইল্যান্ডে..... ১২৫
- সাংস্কৃতিকী ঃ 'God'- 'যেহোবা' ঈশ্বর-আল্লাহ (বিসমিল্লাহ) ..... ১৩২
- পরিশিষ্ট-১ ..... ১৩৬
- আলোকচিত্রের মূল পাঠ ..... ১৪৪

প্রথম খন্ড

# বাংলা সাহিত্যে রামাঞি রচিত শূন্য পুরাণ
## একটি ব্যতিক্রমী প্রসঙ্গ

প্রথম সংস্করণ ১৯৯০

## গৌড় বিজয়ের স্মারক স্বর্ণমুদ্রা

*দ্রুতগামী অশ্বারোহী সেনাসহ নাগরী হরফে গৌড় বিজয় লেখা আরবী হরফে ৬০১ হি/ রমজান ১৯; তারিখ উল্লিখিত হয়েছে। প্রচ্ছদে এই ছবিটি প্রদত্ত হয়েছে। আরবী হরফে দিল্লীর সুলতানের নাম সুলতানুল মুআজজম মুয়িয উদ্দুনীয়াওয়া দীম আবুল মুজাফফর মুহম্মদ বিন সাম লেখা আছে। বখ্তইয়ার নিজের নামে কোন মুদ্রা প্রচলন করেননি।*

*দ্রষ্টব্যঃ- তিনটি মুদ্রা এ যাবৎ যথাক্রমে দিল্লী, লন্ডন ও ওয়াশিংটনের যাদুঘরে মিলেছে।*

# শূন্য পুরাণ-রামাঞি পণ্ডিত

## মূল কাব্য পাঠ ঃ

১। জাজপুর পুর বাদি ষোল সঅ ঘর বেদি
বেদি লয়ে করয়ে নগুন।

২। দক্ষিণা মাগিতে যাঅ যার ঘরে নাহি পাঅ
সাপ দিয়ে পুড়া এ ভূবন।।

৩। মালদহে লাগে কর ন চিনে আপন পর
জালের নাহিক দিস পাস।

৪। বলিষ্ঠ হইল দড় দশ বিশ হয়্যা জড়
সদ্ধর্মিরে কর এ বিনাশ।।

৫। বেদ করে উচ্চারণ বেরয় অগ্নি ঘন ঘন
দেখিআ স্বভয় কম্পমান।।

৬। মনেত পাইয়া মর্ম সবে বোলে রাখ ধর্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্রান।।

৭। এই রূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহারণ
ই বড় হইল অবিচার।।

৮। বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মনেত পাইয়া মর্ম
ময়াত হইল অন্ধকার।।

৯। ধম্ম হৈল্যা জবন রুপি মাথা এত কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।

১০। চাপিআ উত্তম হএ ত্রিভুবনে লাগে ভএ
খোদায় বলিয়া এক নাম।।

১১। নিরঞ্জন নৈরাকার হৈল্যা ভেস্ত অবতার
মুখত বলয় দম্বদার।

১২। যথেক দেবতাগণ সবে হয়্যা একমন
আনন্দেত পরিল ইজার।।
১৩। ব্রহ্মা হৈল্যা মহামদ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ফ হইল শূল পাণি।
১৪। গণেশ হৈল্যা গাজী কার্তিক হৈল্যা কাজি
ফকির হৈল্যা যথ মুনি।।
১৫। তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইল সেক
পুরন্দর হইল মলানা।
১৬। চন্দ্র সূর্য আদি দেবে পদাতি হইয়া সেবে
সবে মিলি বাজায় বাজনা।।
১৭। আপুনি চন্ডিকা দেবি তিঁহ হৈল্যাহায়া বিবি
পদ্মাবতী হৈল্যা বিবি নূর।
১৮। যথেক দেবতাগণ সবে হয়্যা একমন
প্রবেশ করিলা জাজপুর।।
১৯। দেউল দেহারা ভাঙ্গেঁ কাড়্যা ফিড়া খায় রঙ্গে
পাখোড় পাখোড় বলে বোল।
২০। ধরিয়া ধর্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই-বড় বিষম গন্ডগোল।।

(মোট কুড়ি চরনের ছড়া (ত্রিপদি ছন্দ)।

---

## টীকা-টিপ্পনি ঃ-

বেদি-বেদ-ওয়ালা ব্রাহ্মণগণ (বৈদিক)

সদ্ধর্মী-সমকালীন ভঙ্গ বৌদ্ধ সম্প্রদায়। (দলিত নাথ ও বৌদ্ধ)

ধম্ম/ধর্ম-ধর্ম ঠাকুর (সৃষ্টিকর্তা),

অন্ধকার- পাঠান্তর খন্দকার।

জবন- (গ্রীক) বাচ্যার্থে-মুসলমান, এটি অপপ্রয়োগ এবং বিভ্রান্তিকর। যবন জাতি ও ভাষা ব্যঙ্গাত্মক (মূলে ছিল পাশ্চাত্য আক্রমণকারী)।

কাল টুপি- মুসলমানীর প্রতীক।

সম্ভবতঃ- এ-থেকেই পরবর্তী কালে জবন জাতি ও জাবনী ভাষা শব্দ বাংলা ভাষায় প্রযুক্ত হয়েছে। ফারসী ভাষায় 'জবান' মানে ভাষা, আর জবন ধর্মও তাই বিভ্রান্তি।

ত্রিকচ কামান-তীর কশ কামান (ফারসী শব্দ)

হ এ-হয়/ঘোড়া

খোদা-ফারসী ভাষায় খোদা।

আল্লাহর নামান্তর।

নিরঞ্জন (সং নারায়ণ) (নিরাকার আল্লাহ)

ভেস্ত অবতার-বিহিশতের দূত

দম্বদার- (ফা-দম-ই-মাদার) মুসলমানী প্রভাব।

হযরত মাদার পীরের নামে ধ্বনি

পীরের আবির্ভাব কাল-১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দের সমসময়ে (তাবাকাদী সম্প্রদায়)

দেবতাগণ-ব্রাহ্মণগণ

ইজার (ফা)- পাজামা (মুসলমানী পোষাক) অমুসলিমদের ইজার পরিধান ও ইসলামী ব্যবস্থায় সায় দেওয়া মানে ইসলাম সমর্থন বুঝায় বটে, তবে প্রকৃত ইসলাম তত্ত্বের অবধারণ ভিন্ন কথা। এখানে তাই-ই-হয়েছে। রামাঞি পণ্ডিতের শূন্য পুরাণে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। যথাস্থানে তার ব্যাখ্যা দেয়া যাচ্ছে।

চন্ডিকা-হিন্দু দেবী, চন্ডী। শিবের ঘরণী, নামান্তর উমা (দেবাদিদেব শিব-আদি পিতা)।

র্তিহ-সেই (তিন)

হায়া বিবি-হযরত বিবি হাওয়া (Eve)

আদি পিতার স্ত্রী নামান্তর-উম্মু (হিঃ) আদি মাতা।

পাখোড় (উর্দু)- 'পাকড়াও'-বন্দী কর, ধর।

গন্ডগোল-গৌড় বিজয়কালীন বিশৃঙ্খল অবস্থা।

রামাঞি পন্ডিত- কবির নাম।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-ত্রিত্ববাদী চেতনা/ ওঁ তৎসৎ/ সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের অধিশ্বর (অ+উ+ম) এক আল্লাহ, তিনরূপে প্রকাশ (শিশুতোষ ধারণা)।

মহামদ- মুহম্মদ (মদামদ দেব) সৃষ্টিতত্ত্ব মুতাবিক।

সম্ভবতঃ নূর-ই-মুহম্মদীর সাদৃশ্যে। হিন্দু মতে-তেজ/আদ্য জ্যোতি থেকে উদ্ভূত। ইসলাম মতে, মুহম্মদ শেষ নবী, তাই তার স-শরীরে আর্বিভাব শেষ যুগে। মুসলমানী মতে, হযরত ইব্রাহীমই মানব জাতির আদি পিতা। বাইবেল মতে-আব্রাহাম ব্যুৎপত্তি-ইব্রাহীম<আব্রাহাম< বারহামা।

ব্রহ্মা- পিতামহ (স্বয়ং), ভগবান (ভারতীয় হিন্দুদের মতে)। পেকাম্বর (ফা.) পয়মবর/ পয়গম্বর (নবী)। এখানে বিষ্ণুকে পয়গম্বর বলা হয়েছে। হিন্দু মতে, বিষ্ণু-স্থিতির অধিস্বর। আদম- (হযরত আদম)-হিন্দু মতে, শূল পাণি প্রলয় কর্তা (শূল পাণিতে যাহার)। ত্রিশূলে আল্লাহ নামের প্রতীক আছে বলে সুফী মুসলমানগণ অনুমান করে। ইসলামে-নবীরা আল্লাহ নন- আল্লাহর দূত মাত্র। লেখক যেহেতু পৌত্তলিক তাই তাঁর রচনাও পৌত্তলিক ভাবাপন্ন। সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনে প্রতীক দেবতার বিরোধিতা করা হয়েছে। বলা হয়েছে- আদ্য বাণী বিসমিল্লাহতে এই তিনটি নাম আছে, যাতে নিরাকার আল্লাহর গুণগান করা হয়েছে। নাম তিনটি আল্লাহ, রহমান ও রাহীম। (=বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম)। অর্থ-আল্লাহ, যিনি জগৎসমূহের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও দাতা। হিন্দু শাস্ত্রেও এই নামে স্রষ্টার তিনটি নামের মহিমা প্রচারিত হত- (সত্যম, শিবম, সুন্দরম)। শিশুতোষ মূর্তিকল্পনা পরবর্তী কালের। মানব জাতির আদি পিতা হওয়ায়- শিবপুত্র কার্তিক গণেশকে শিবের পুত্র বলা হয়েছে। এই হিসেবে কার্তিক-গনেশকে মুসলমানী 'কাজি' ও 'গাজি' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, কাজি অর্থ (ফা) বিচারক, এবং গাজী অর্থ ধর্ম যোদ্ধা। এটি রীতিমত তৌহিদ/ একত্ত্ববাদ বিরোধী কথা (কুফুরী কালাম)। নিতান্তই উদ্ভট কাহিনী।

নারদ-হিন্দু মতে দেবর্ষি/ দেবদূত (তুং হযরত জেব্রাইল আঃ)। পুরন্দর-ইন্দ্র-দেবরাজ (মূর্তি দেবতা)।

তুং কি কালাম পাঠাইলেন আমার সাঁইদয়াময়
এক এক দেশে এক এক বাণী কোন খোদা পাঠায়।
এক যুগে যা পাঠায় কালাম
আর যুগে তা হয় কেন হারাম
দেশে দেশে এমনি তামাম
ভিন্ন দেখা যায়।
যদি একই খোদার হয় বর্ননা
তাতে তো ভিন্ন থাকেনা
মানুষের সব রচনা
তাইতে ভিন্ন হয়।
এক এক যুগে এক এক বানী
পাঠান কি সাঁই গুণ মনি
মানুষের রচনা জানি
লালন ফকির কয়।

হরফ সংকেৎ ঃ তুলনীয় -তুং, ফারসী- ফা; কুরআন-কু।
হিব্রু-হিঃ < >- বৃহত্তর, ক্ষুদ্রতর।

তুং আল কুরআনের উক্তি ঃ

"ইন্না আনজাল না কুরআনান আরাবীয়ান লায়াল্লাকুম তাকিলুন (দ্রঃ আল-কুরআন। সুরা ইউসুফঃ ১২/১, ২, ৩।

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা কুরআন আরবী ভাষায় নাজিল করেছি এই জন্য যে তারা যেন সুস্পষ্ট ভাষায় আমার বাক্য (কালাম) বুঝতে পারে। কালাম/ বাক্য পবিত্র কুরআনের বাণী। সকল দেশে সকল যুগে বিভিন্ন পয়গম্বর/ আল্লাহর বিশেষ দূতের মারফত পাঠানো হয় (দ্রঃ লেকূল্লে-কাউমিল হাদ। কুঃরাদঃ ২৩,৭)। বিশ্বের প্রথম শ্রেষ্ঠ বাণী বাহক হযরত মুসা (আঃ) এর মাধ্যমে এই বাণী প্রথম পাঠানো হয়। ঐতিহ্য সূত্রে জানা যায়, যুগে যুগে লক্ষাধিক নবীর মাধ্যমে মোট ১০৪ খানি সহিফা/ সংহিতা বাণী পাঠানো হয়েছে। তার মধ্যে চারখানি প্রধান- তৌরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন। মতান্তরে- ঋক, সাম, যদু, অথর্ব। এটি ভারতীয় হিন্দু মত।

মুসলমানী মতে, অথর্ব শেষ বেদ/ কুরআন। ভারতীয় হিন্দুদের মতে ঋক/ সাম বেদই প্রথম। পরবর্তী কিতাবের নাম সাম। 'সাম' অর্থ গান/ বিভূস্তোত্র/ ভগবান উবাচ। মানে, ভগবানের উক্তি/ অপৌরষের বাণী। কুরআন মতে, এর নাম ওহী/ বহি। হযরত মুসার কিতাবকে প্রথম বেদ/তৌরাত (তুরাহ) বলা হয়। বাইবেল মতে ঋক ও সামবেদ (পুরাতন নিয়ম) ইঞ্জিন (নতুন নিয়ম) একত্রে (পুরাতন এবং নতুন) এবং কুরআন শেষ বেদ আসমানী কিতাব।

কুরআনে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে- এ গ্রন্থ (কুরআন) মুসার গ্রন্থের সমর্থক আরবী ভাষায়। এ সীমা লংগনকারীদের জন্য সতর্ককারী এবং তাদের সুসংবাদদাতা (দ্রঃ কুঃ ৪৬:১২)। এই সঙ্গে আরও বলা হয়েছে আমি (আল্লাহ) যদি আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় কুরআন নাযিল করতাম ওরা অবশ্যই বলত, 'এই আয়াতগুলি বোধগম্য ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য। এর ভাষা আজমী (অনারব) অথচ রসুল আরবীয়। বল, বিশ্বাসীদের জন্য এ পথ নির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার স্বরূপ (দ্রঃ কুঃ ৪১:৪৪)।

উল্লেখ্য, কুরআনে আল্লাহসহ সকল নবী ও পয়গম্বরদের নাম হিব্রু/ ইর্বানী ভাষায়। একমাত্র শেষ নবী হযরত মুহম্মদ ও আহমদ আরবী ভাষায় বিবৃত। কুরআন সর্বশেষ নবীর উপর অবতারিত সর্বশেষ গ্রন্থ। তাই কুরআনকে পূর্ণতম কিতাব ও বাণী (পুনাংর্গ জীবন ব্যবস্থা) বলা হয়েছে। এটি মার্তৃ ভাষায় প্রেরিত। অন্যত্রও বলা হয়েছে, যদি তোমরা সন্দেহ কর যে, আমি আমার বান্দার উপর যে আয়াতসমূহ নাযিল করেছি (তা সত্য নয়) তবে তার অনুরূপ কোন অধ্যায় রচনা করে আনো। এ ব্যাপারে তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদেরও সহায়তা নিতে পারো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (দ্রঃ কুঃ)।

এতে আরও সাবধান করে বলা হয়েছে যে, তাতেও তোমরা নিশ্চয়ই সফল হতে পারবে না (দ্রঃ কুঃ পূর্বোক্ত)।

## সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

সংক্ষেপে বিষয়টি এই- ব্রাহ্মণ্যবাদী সম্প্রদায়ের অত্যাচারে জাজপুর ও মালদহ এলাকার ষোল শত দলিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জনগণের কাতর ক্রন্দনে অতিষ্ঠ হয়ে ভগবান নিরঞ্জন বৈকুণ্ঠ থেকে জবন রাজার (মুসলমান) রূপ ধরে নেমে এলেন (আলোর দূত)। কবি কল্পনা করেছেন, নৈরাকার নিরঞ্জনকে নামতে দেখে স্বর্গের সকল দেব-দেবীও নেমে এসে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এক জামাত হয়ে জবন রাজার ধর্ম ও সভ্যতার শামিল হয়ে সকলে আনন্দ বাজনা বাজাতে শুরু করলেন (বখতিয়ারের গৌড় বিজয়ের ইশারা)।

এই দেব-দেবীর মধ্যে স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও (যারা ভগবানের অংশী হিসেবে সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন) নেমে এসে জবন রাজার বশ্যতা স্বীকার করলেন ইত্যাদি। বলা হয়েছে জবন-মুসলমানের প্রতীক। নামান্তর 'ধর্ম মহারাজা' আপাত দৃষ্টিতে কাহিনীটি অদ্ভুত মনে হতে পারে বটে, তবে ইসলাম বিশ্বাসে নবীরা মানুষ মাত্র। তাই তাদের মিলন অবশ্যম্ভাবী। কারণ ইসলাম বিশ্বাসে এক আল্লাহর কোন শরীক/অংশী নেই। দেব-দেবী মূর্তি কল্পনা ও তার পূজা অর্থহীন। তাই দেশ ইসলামী সভ্যতার আওতায় আসায় এই সব কাল্পনিক দেব-দেবী মূর্তিও অসার বলে বিবেচিত হল (সময়কাল-আনু, ১২০৩-১৩৫৭ খ্রীঃঅঃ) শাহে বাঙ্গালাহ-শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের সমসময়ে)। বৌদ্ধ কবি পন্ডিতজী অবশ্য সকল ধর্মকে সমন্বিত করে এ নবীন বাঙালী ('জবন') ধর্ম প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছেন। তবে তিনি হয়ত ভুলে গিয়েছিলেন যে, জগৎ স্রষ্টা (জগন্নাথ) কোনো মূর্তিতে ধরা দেন না। তাই তার অন্যতম গ্রন্থ 'ধর্ম পূজা বিধানে' যে নিমকাঠের প্রতিমা পূজার কল্পনা করেছেন, তাও নিতান্তই অর্থহীন এবং ইসলাম বিধ্বংসী/ NEGATIVE কল্পনা। বিস্তারিত আলোচনা যথা স্থানে করা যাচ্ছে।

## শূন্য পুরাণের ঐতিহাসিকতা ঃ

শূন্য পুরাণের রচনাকালের সঠিক পরিচয় পাওয়া না গেলেও তার ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করা যায় না। মুহম্মদ বিন বখ্‌তইয়ারের রাজ্য জয়কালের সুনির্দিষ্ট তারিখ শিলালেখ সূত্রে পাওয়া গেছে (৬০১ হিঃ/১২০৩ খ্রীঃ অঃ)। তার তিনটি স্মারক স্বর্ণ মুদ্রাও মিলেছে। তাই শূন্যপুরাণের কাল না পেলেও ক্ষতি নেই। বিশেষজ্ঞগণ তার সঠিক কাল নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণও করেছেন। কিন্তু কোন সঠিক তারিখ নির্ণীত হয়নি। তবে এ ব্যাপারে বহুভাষাবিদ পন্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র এতদ্বিষয়ক

সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি যথার্থই বলেছেন, "তুরকীগণ কর্তৃক বাঙ্গালা বিজয়ের স্মৃতি যখন মুছিয়া যায় নাই তখন এই অংশ (দ্বিতীয় অংশ) রচিত হয় এবং সমস্ত শূন্য পুরাণের ভাষা হিসেবে সংস্করণ বা নবীকরণ (MODERNIZATION) সাধিত হয়। নিরঞ্জনের রুস্মা এই দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত (শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, ১৯৫৩, পৃঃ-১১০) নিরঞ্জন এখানে নিরাকার একেশ্বরের প্রতীক। শূন্যপুরাণের রচনার প্রথম স্তর বঙ্গবিজয়ের সমকালের বা পূর্বকালের হতে পারে, অবশ্য এখানে কাহিনীসূত্র সম্পর্কে বলা যেতে পারে।

কারণ, নিরঞ্জনের রুস্মার (উস্মা) প্রথম অংশ নিঃসন্দেহে গৌড় বিজয়ের পূর্বকালীন ঘটনা। যার ফলে বখতিয়ার খলজীকে গৌড় আক্রমণ ও বিজয় করতে হয়েছে। নইলে সামান্য সংখ্যক মুসলিম ঘোড় সওয়ারদের পক্ষে এ বিজয় সম্ভবপর বিবেচিত হয় না।

অত্যাচারের স্টীম রোলার যখন দলিত সদ্ধর্মীদের উপর নেমে এসেছিল, তখনই তাদের করুণ ক্রন্দন ধ্বনি নিরঞ্জনের দরবারে হাজির হয়েছিল। এর চেয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে? সম্ভবতঃ এই অংশে খালজী আক্রমণ নয়- তার বহু পূর্ববর্তী কালে 'বঙ্গাল বল' নামক ব্রাহ্মণ্য সেনা বাহিনী 'সোমপুরী বৌদ্ধ বিহার' ধ্বংস কাহিনীর স্মৃতি তখন কবি মনে জাগ্রত ছিল (দ্র. শহীদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ-১১০)। বলতে বাধা নেই, ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজগণ কর্তৃক দলিত বৌদ্ধবাদী সদ্ধর্মী ও নাথদের উপর এই নির্বিচার অত্যাচারই ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজার পতনের একমাত্র কারণ। (খালজী আক্রমণ নিমিত্ত মাত্র। অন্যথায় সামান্য সংখ্যক বৈদেশিক আক্রমণকারীর পক্ষে এতবড় আকস্মিক বিজয় সম্ভব না। তিনি আরও বলেছেন, -"এই ছড়ায় মুসলমানের খোদা ও ব্রহ্মা পেগাম্বর (পারসী পয়গম্বর) ও বিষ্ণু, আদম ও শিব, হাওয়া (Eve) ও চন্ডিকা, নুরবিবি (ফাতিমাহ্) ও পদ্মাবতী, গাযী ও গনেশ, কাযী ও কার্তিক, এক মৌলানা ইন্দ্র। ইসলামের প্রভাবে নিরঞ্জন খাঁটি একেশ্বরবাদের ঈশ্বর বাচক শব্দগুলি বর্জন করিলেও নিরঞ্জন বর্জন করেন নাই (বাংলা সাহিত্যের কথা, শহীদুল্লাহ ১৯৫৩, পৃঃ-৯২)"। এর পরেই টীকাতে লিখেছেন- "গাযী ও কাজী দুইজন পীর। গাযী বোধ হয় কালু গাযী। ঘরে আগুন লাগিলে একটি লাল মোরগ কাযী সাহেবের জন্য 'হাজত' দেওয়া হয়।" উল্লেখ্য, আরও পরবর্তীকালে চব্বিশ পরগনার হযরত গোরা চাঁদ/ সৈয়দ আব্বাস আলী মক্কী, যিনি ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেবের পূর্ব পুরুষ ছিলেন, তাকেও গৌরাঙ্গ দেবের সঙ্গে একাকার করে ফেলা হয়েছে। এই গোরাচাঁদ ছিলেন সিলেটের হযরত শাহ জালালের ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম। এ ব্যাপারে ডক্টর সুকুমার সেন সকলের অগ্রণী। (দ্রঃ ইসলামি সাহিত্য। বর্ধমান সাহিত্য সভা, ১৯৫০)।

এ ছাড়া খুলনা বাগেরহাটের সুন্দরবন অঞ্চলে মুসলমানী বনবিবির কাহিনীকে হিন্দুয়ানী বনদেবী/বনদুর্গার কাহিনীর ঢালাই করে বন বিবি পূজা তলাকে গুলজার করে তোলা হয়েছে। উল্লেখ্য বনবিবির কাহিনী ছিল, তৌহিদী পৌত্তলিক বাংলাদেশে তা বনদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। সব থেকে কৌতুহলজনক ব্যাপার ঘটেছে, আখেরী নবী রসুলুল্লাহ (দঃ) এর প্রিয়তমা কন্যা মা ফাতিমাহকে নিয়ে। পৌত্তলিক কবির ভাষায়, তিনি হয়ে উঠেছেন 'প্রথমে বিবি নূর' পরে পুরাদেবী 'কালিমার' প্রতিরূপ হয়ে উঠেছেন। যথা, বাংলা প্রবাদ-

"কালী ঘাটে কালী মা
হায় আলী, হায় ফাতিমা।"

কোথায় কালীমা কাল্পনিক (দেব প্রতিমা), আর কোথায় রক্তমাংসের মানবী ফাতিমাহ্। বিশেষ করে যেখানে ইসলাম পৌত্তলিকতা বিরোধী। তুলনীয় হিন্দু শাস্ত্রীয়-ওঁকার ধ্বনি। ব্যাখ্যা আগেই দেওয়া হয়েছে। পুতুলে আর মানুষে কোন তুলনা হ'তে পারেনা। বিশেষ করে ইসলাম যখন পৌত্তলিকতা বিরোধী। শেষ ধর্মগ্রন্থ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ায় এই ধারণা বাতিল হয়েছে। কারণ কুরআন শেষ আসমানী কিতাব। (কুরআনের দাবি-সত্যের আগমণে মিথ্যার বিলয় অবশ্যম্ভাবী)

তুং আউয়ালে বিসমিল্লাহ রর্থ।
আর জানো তার তিনটি অর্থ।
-লালন ফকির।

শূন্যপুরাণের কবি ছিলেন সদ্ধর্মী, মানে, শূন্যবাদী/ বৌদ্ধ। তাই ইসলামী তৌহীদবাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা বসে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ব্যাখা দিয়েছেন। অবশ্য নবাগত ইসলাম ধর্মকে তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তাই তার ভুলটি ইচ্ছাকৃত বলা যায় না, তবে ভ্রান্ত। তাই তাঁর অনুমিত যবন ধর্ম ও যবন-সভ্যতা সম্পর্কিত ধারণাও নিতান্তই ভ্রান্ত। কৌতুহলজনক বলে- তাঁর অনুমিত যবন-রাজের কাল্পনিক চেহারাটির কথা স্মরণ করা যায়। যেমন,

"দশম মূরত বোলালে জগন্নাথ।
নিমের পৃতিম সোবন্যের দু'টি হাত।।
হিঁন্দু-মুছুলমান তোথা একছত্র করিয়া।
আপনি জানান প্রভু জানাম জানিয়া।।
হাতে লিয়ে তির খামটা পায়ে দিয়ে মজা।
গৌড়ে বোলান গিয়া ধর্ম মহারাজা।।"

দশম অবতার বলতে হিন্দু মতে, শ্রীকৃষ্ণের অবতার কল্কি/জগন্নাথ। কে এই ধর্ম মহারাজা? গৌড়ের মুসলমান রাজা। ইসলামে আল্লাহর কোন শরীক/ অংশী কল্পনা কবীরা গুনাহের কাজ। কবি এখানে তাই ভেবেছেন। গৌড়ের মুসলমান রাজার রূপ ধরে ধর্মমহারাজ এসেছেন।

আসলে ঝগড়াটি বেঁধেছে 'তৌহিদ' আর বহুত্ববাদী ধারণার মধ্যে। সতেরো শতকের কবি আলাওল যথার্থই বলেছেন-

"মূর্খনাং প্রতিমা দেবা বিপ্র দেবো হুতাশনঃ
যোগীনং প্রার্থনা দেবো দেব দেবো নিরঞ্জন।"

নিরঞ্জন এখানে একেশ্বর বাদের আল্লাহর প্রতীক। অর্থও করেছেন কবি-

"মূর্খ সকলের দেব প্রতিমা সে সার।
ব্রাহ্মণ সবের দেব অগ্নি অবতার ॥
যোগী সকলের দেব আপ্ত মহাজন।
সকল দেবের দেব প্রভূ নিরঞ্জন ॥
(পদ্মাবতী। আলাওল)

*(দ্রঃ শহীদুল্লাহ। বাংলা সাহিত্যের কথা/ ২য় খন্ড, ১৯৬৭, পৃঃ ২১২।)*

বলা বাহুল্য, স্বর্গীং দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর "প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান" গ্রন্থে এই অংশের পাঠান্তর দিয়েছেন, তা ভ্রান্ত এবং পৌত্তলিক ধর্মী। যেমন,

"মুর্খস্য প্রতিমা দেবা বিপ্রদেব হুতাশনঃ
যোগীনং প্রমথ দেব, দেব দেব, নিরঞ্জন"।
(ঢাক, ১৯৪০, পৃঃ ৫৮)।

দ্বিতীয় চরণে- 'যোগীনাং প্রমথ দেব' নিতান্তই পৌত্তলিক ধারণামূলক। ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেবের পূর্বোদ্ধৃত পাঠে দেখা যাচ্ছে-পাঠটির মূলে ছিল 'যোগীনাং প্রার্থনা দেব'।

দীনেশ বাবুর পাঠে প্রার্থনা স্থলে 'প্রমথ'/ শিব হওয়ায় মূল পাঠই তৌহিদ বিরোধী হয়েছে। এটি নিত্যান্তই স্বাভাবিক। হিন্দু পন্ডিত প্রার্থনাকে 'প্রমথ' দেখেছেন। উল্লেখ্য, কবি আলাওলের মূল পাঠে 'প্রার্থনা' আছে। তাই বলা বাহুল্য, প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হওয়ায় বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের রচনা পৌত্তলিক রাগ রঞ্জিত হয়ে সম্পূর্ণ চিন্তা-চেতনাই ভ্রান্ত পথে চালিত করেছে। এ ব্যাপারে ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন থেকে ডক্টর অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় পর্যন্ত ব্যতিক্রম নয়। অবশ্য রামাঞি পন্ডিতের শূন্য পুরাণের নিরঞ্জনের রুষ্মা/ 'কলিমা জাল্লাল' থেকে

তার সূত্রপাত হয়েছে বলা যেতে পারে। এর পরবর্তী রূপ মিলেছে ভারত চন্দ্রের "অন্নদা মঙ্গল' কাব্যে (১৭৫২ খ্রীঃ)। ভারতচন্দ্রের কাব্যও যেমন যবন-বিরোধী, তেমনি ভাষাও তির্যক (জাবনী-মিশাল)। যেমন,-

"মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী
উচিত সে আরবী পারসী হিন্দুস্তানী।
বুঝিয়াছি যেই মত বর্নিবারে পারি
কিন্তু সে সকল লোক বুঝিবারে ভারি।
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রশাল
অতএব কহি ভাষা জাবনী মিশাল।

বলা বাহুল্য এটি রীতিমত ব্যঙ্গাত্মক। আরও কৌতুহলের ব্যাপার, আলোচ্য শূন্যপুরাণ, কাব্যের মূল নামই ছিল 'আগমপুরাণ, যা ছিল মূল কাহিনীরই অনুগামী, সম্পাদক প্রদত্ত নামটিই ভ্রমাত্মক। ফলে এর সঙ্গে একটি ভ্রান্ত জীবন দর্শন যুক্ত করে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ব্যাখ্যা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে বাংলা ভাষাও যবন যাবনী ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। নিতান্তই উদ্ভট মনে হয়েছে।

বলা বাহুল্য, এ যাবনী শব্দটিই আরবী ফারসীর ওয়ারিস নয়। এর নাম হওয়া উচিত ছিল 'জবানে বাঙ্গালা/ জবান মানে ভাষা। সম্ভবতঃ ভারত চন্দ্র রামাঞি পন্ডিত বা সমমনা লেখকদের কাছ থেকে শব্দটি ধার করে নিয়েছেন। উল্লেখ্য, বাঙালী মুসলমান কবিগণ অবশ্য যবন শব্দটিকে ব্যবহার যোগ্য মনে করেন নি। তাঁরা একে ব্যঙ্গার্থেই গ্রহণ করেছেন। এবং তার পরিবর্তে 'জবানে বাঙ্গালা' 'জবানে মুসলমানী' ইত্যাদি নাম ব্যবহার করেছেন। যার কোন প্রয়োজন ছিল না। সম্প্রতি ষোড়শ শতকের অবজ্ঞাত কবি আব্দুল আলীমের 'মৃগাবতী' কাব্যে যার নমুনা মিলেছে। আব্দুল আলীম সুলতান হোসেন শাহের সভা কবি ছিলেন (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ অঃ)।

সম্প্রতি এই কবির মূল কাব্যের একাধিক পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে।

উনিশ শতকের কবি জামাল উদ্দীন যথার্থই বলেছেন-

"জবন পবিত্র কুল বিধি বেদে বলে
অকুলে পাইছে কুল জবনের কুলে।
ফুলের উত্তম যেন গোলাবের ফুল
কুলের উত্তম তেন মুসলমানী কুল ইত্যাদি।
(প্রেমরত্ন কাব্য)।

'বেদ' অর্থ- ভারতবর্ষীয় ধর্ম গ্রন্থ (চতুর্বেদ)। সত্যিকথা বলতে কি বেদ কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ ছিলনা। তাই রামাঞি পন্ডিতের ভাষায় 'জবন ধর্ম' ছিল রীতিমত উদ্ভট এবং পৌত্তলিকতা যুক্ত এক মিশ্র ধর্ম ও মিশ্র ভাষা। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই ভাষাই পরবর্তী কালে তথাকথিত দোভাষী বা মুসলমানী ভাষা বলে নিন্দা করা হয়েছে। যা নিতান্তই অর্থহীন। আজও তার জের চলেছে। এবং বলতে বাধা নেই বিভ্রান্ত হিন্দু পন্ডিতগণ এই ভাষাকেই জাবনী ভাষা নামে পরিচিত করার বৃথা প্রয়াস পেয়েছিলেন। পরবর্তী কালে অবশ্য এর প্রতিবাদ হয়েছে।

(দ্রঃ মুহম্মদ আবু তালিব। বাংলা সাহিত্যের ভাষা ঃ সাধতা বনাম অসাধতা। ই-ফা, ঢাকা, ১৯৭৯)।

বলাবাহুল্য, ঐশী গ্রন্থের ভাষা আরবী, ফারসী বা আঞ্চলিক ভাষা নয়- মাতৃভাষা, মায়ের মুখের ভাষা থেকে আলাদা নয়।

## রামাঞি পন্ডিতের কাল ও ভাষা

পরিশেষে উল্লেখ্য, বাংলা সাহিত্যের দ্বিজ রামাঞি পন্ডিতের আবির্ভাব কালের সঠিক পরিচয় না মিললেও এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মুহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ারের গৌড় বিজয়ের প্রেক্ষিতে সৃজ্যমান ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির প্রাক্কালে কোন এক সময়ে তার আবির্ভাব হয়। ১১৫০ বাংলা সালে (১৭৪৩ খ্রীঃ অঃ) অনুলিখিত একখানি কলমী পুঁথি থেকে এই বিবৃতি উদ্ধারকৃত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একে একটি শূন্যযুগ ধরা হলেও এ কথা নিশ্চিত যে, রামাঞি পন্ডিতের এই গ্রন্থটিতে তার শূন্য পূরণ হয়েছে। কাল আনুমানিক ১২০৩-১৩৩৭ (খ্রীঃঅঃ)। বাংলার ইতিহাসে এটি 'শাহে বাঙ্গালা' উপাধিধারী সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের আবির্ভাব কাল (১৩৫১-১৩৫৭ খ্রীঃ অঃ)।

এর পরেই আমরা বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনতম কবি বড়ু চন্ডীদাস (১৩৭৯-১৩৮৯ খ্রীঃ অঃ) ও শাহ মুহম্মদ সগীরের আবির্ভাব কাল (১৩৮৯-১৪১০ খ্রীঃ অঃ) দেখতে পাই। সম্ভবতঃ এই সময়েই বাংলা ভাষা 'জবানে বাঙ্গালা' নামে অভিহিত হয় (দ্রঃ আমীর খুসরও (১২৫২-১৩২৫) নূহ-ই সিফর। ড. ডব্লিউ মির্যা। লন্ডন, ১৯৫০।

রামাঞি পন্ডিতের কাল এরই পূর্ববর্তী কাল। শূন্য পূরাণের ভাষা-বিচারেও এই অনুমান দৃঢ় হয়। অনেকের একটি ভ্রান্ত ধারণা এইরূপ যে, শূন্য পুরাণকার যেহেতু একজন সদ্ধর্মী। ভঙ্গ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোক তাই শূন্যপুরাণে এরূপ বিশুদ্ধ আরবী ফারসী ভাষার প্রয়োগ বিস্ময়কর। অবশ্য পন্ডিতজী শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেছেন,

তবে ইসলাম তত্ত্বের বিষয়ে অনভিজ্ঞতার কারণে মাঝে মধ্যে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। যেমন তিনি দেব-মানবে একাকার করতে চেয়েছেন। একজন শূন্যবাদী কবির পক্ষে এটি স্বাভাবিক। কিন্তু আলোচনা কালে আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের যথেচ্ছা ব্যবহারই ইসলামী পরিবেশ রচনা নয়। বরং শূন্য পুরাণের ভাষা নিতান্তই উদ্ভট এবং বিভ্রান্তিকর। বিশেষভাবে তার 'জবন ধর্ম' ও 'যবনাচার' সংক্রান্ত উক্তি সম্পূর্ণই ইসলাম বিরোধী ও কাল্পনিক। জবন কোন ভাষার শব্দ?

মুসলমান (ইসলাম) ধর্ম বলতে যবন ধর্ম আরবী-ফারসীতে তো নেই-ই উপরন্ত জবনী/ জাবনী ভাষাও অবান্তর। এটি মুসলমানদের পক্ষে একটি গালি ব্যতীত নয়। জবান শব্দটির অর্থই ভাষা/ মাতৃভাষা। সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে যবন ধর্ম ও জবন/ যবন ভাষা ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সম্ভবতঃ রামাঞি পন্ডিতের পরে এটি কবি ভারত চন্দ্রের হাতে 'জাবনী' নামে অভিতিহ হয়েছে। তাই বলা বাহুল্য, ভারত চন্দ্রের ভাষার আসল নাম হওয়া উচিত ছিল, 'জবানে বাঙ্গালা'। যাবনী তার বিকৃত নাম। শুধু তাই নয়, বাংলা জবান শব্দটি 'জাবনী' নাম প্রাপ্ত হয়ে জবন ভাষা নয়, জবন নিধন মন্ত্রের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরিণামে বাংলা ভাষা থেকে আরবী ফারসী নিসুদন যজ্ঞের সূত্রপাত হয়েছে (দ্রঃ সজনী কান্ত দাস, আধুনিক গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা) ফলে সত্য ভাষা জবানে বাঙ্গালা একটি মিথ্যা (জাবনী বা মুসলমানী বাংলা) নামে চিহ্নিত হয়েছে। আগে বলা হয়েছিল 'অসুর ভাষা' অপভাষা। সত্যি কথা বলতে কি, আধুনিক বাংলায় এসে তা আবার সাধু চলিত বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে। আরও কৌতুহলের ব্যাপার ব্যবহারের কৌশলে সাধুকে অসাধু এবং অসাধুকে সাধু নামে (চলিত) বলে নিন্দা করা হয়েছে। যেমন, বাংলা ভাষায় হিন্দু বিশ্বাসের আদি মাতা আদ্যা শক্তিকে বলা হয়েছে আদি মাতা/ কালীমা/ মা কালী, মুসলমানী ভাষায় তার নাম ছিল আদ্য বাণী 'কালিমাহ্'/ 'বিসমিল্লাহ' । হিন্দু ভাষায় বাণী/ বাগ্দেবী, স্বরস্বতী মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত ও পুজিতা হয়েছেন। এই আদ্যার গর্ভে আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ওমহেশ্বরের (অ+উ+ম) জন্ম কল্পনা করা হয়েছে। এক ও অদ্বৈত আল্লাহকে তারা সুস্পষ্ট তিনটি মূর্তিতে কল্পনা করে তাঁর পূজা দেয়। এযে শিশুতোষ কল্পনা বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে তা সকলেই জানে।

তাকে জগন্নাতা জগদ্ধাত্রী হিসেবেও বহুভাবে পূজা দেওয়া হয়। আর কতনা সে রূপ। সাম্প্রতিক ভারতে মহাত্মা রাজা রামমোহন হিন্দু ধর্মের সংস্কার করে যে নবীন দর্শন খাঁড়া করেছিলেন, তাতেও তাঁর অদ্বৈত রূপের স্বীকৃতি আছে। তাঁর তুহফত গ্রন্থে (ফা, তুহফাত-উল-মুআহ, হিদীন) তার সম্যক পরিচয় আছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার উপর ভিত্তি করে সমুন্নত হিন্দু ধর্মের যে রূপ খাঁড়া করেছেন, বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের তা অজানা নেই।

এ বিষয়ে তাঁর সর্বশেষ আহবান ধ্বনিত হয়েছে ভারত-তীর্থ কবিতায়। যেমন,

এসো হে আর্য, এসো অনার্য
হিন্দু মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো এসো খ্রীষ্টান।
মার অভিষেক এসো এসোত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।

এটি কি মধ্যযুগীয় ফারসী কবি মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমীর নিম্নলিখিত বাণীর মত শুনায় না?

"বাজ আঁ বাজ আঁ
হর আঁচে হাস্তী বাজ আঁ।
গর্ কাফির গর গবর ওয়া
বোতপোরস্তী বাজ আঁ।
ই- দরগাহে মা দরগাহে
না উম্মিদ নীস্ত।
শত্বার গর তওবাহ শিকস্তী বাজ আঁ।

তৌহীদী ভাষায় এর অনুবাদ ঃ

"এসো হে (আর্য, এসো অনার্য)
আল্লাহর দরগাহে এসো।
এখানে জাত-অজাতে কোন বাছবিচার নেই।
এ আল্লাহর দরগাহ
সকলেরই এখানে সমান অধিকার।
এখানে কেউ খালি হাতে বিমুখ হয়ে ফিরে যাবেনা
শত বার তওবাহ করে ভঙ্গকারী,
ফিরে এসো, ফিরে এসো
এখানে কেউ খালি হাতে ফিরে যাবে না।

কৌতুহলের ব্যাপার, কবি রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে নিরাকার একেশ্বরবাদী (মোয়াহেদ) মানব ধর্মের অনুসারী হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান কবিতায় দেখা যাচ্ছে, বাহ্য দৃষ্টিতে পৌত্তলিকতা বর্জন করলেও তিনি

নিরাকার একেশ্বরবাদের বদলে বহুত্ববাদী পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত হয়েছেন, যা রাজা রামমোহনের চিন্তা চেতনা থেকেও পৃথক। তিনি বাহ্য দৃষ্টিতে মূর্তিপূজা বিরোধী (মোয়াহেদ), কিন্তু অন্তরে বহুত্ববাদী (নর-দেবতা পূজারী)।

আলোচ্য অংশে-

"মার অভিষেক এসো এসো ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা" ইত্যাদি।

অভিনব মানবতাবাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন, যা নিতান্ত অংশীবাদী পৌত্তলিক চেতনা সম্পন্ন। তৌহীদবাদ বিরোধী তো বটেই, এটি রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মচেতনা থেকেও পৃথক। মনে হয়, এখানে তিনি শূন্য পুরান বর্ণিত যবন ধর্মেরই অনুসারী।

মনে করি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের রামঞি পন্ডিতের শূন্যপুরাণেও এই উদ্ভট ও উৎকট সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল। যেমন,

"ব্রহ্মা হৈল্যা মহামদ
বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল্যা শূল পাণি।
গণেশ হৈল্যা গাজি
কার্তিক হৈল্যা কাজি
ফকির হৈল্যা যত মুনি।

তৌহিদ আর বহুত্ববাদের এ মিলন সম্ভব কি?

তিনি অবশ্য এক স্থানে তার পরিণাম লক্ষ্য করে বলেছিলেন-

"নিরঞ্জন নৈরাকার হৈল্যা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলায় দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ হয়া সবে একমন
আনন্দেত পরিল ইজার।।

তার মানে কি এই নয় যে, নিরঞ্জন নিরাকার আল্লাহর নির্দেশে দেশবাসী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের দেবতাগণ একমন হয়ে পবিত্র ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হয়েছিলেন। তা হলে তো সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। শুধু ইজার পরলেই কি মুসলমান হওয়া যায়? ইসলাম নিরাকার এক আল্লাহবাদী মানব ধর্ম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলিম বিজয়ের পরে বাংলা সাহিত্যের ধারায় রামাঞি পন্ডিতের শূন্যপুরাণের ভাষাই বলবত হয়ে আছে। বাংলাদেশ যে তিমিরে সেই তিমরেই আছে। আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন।

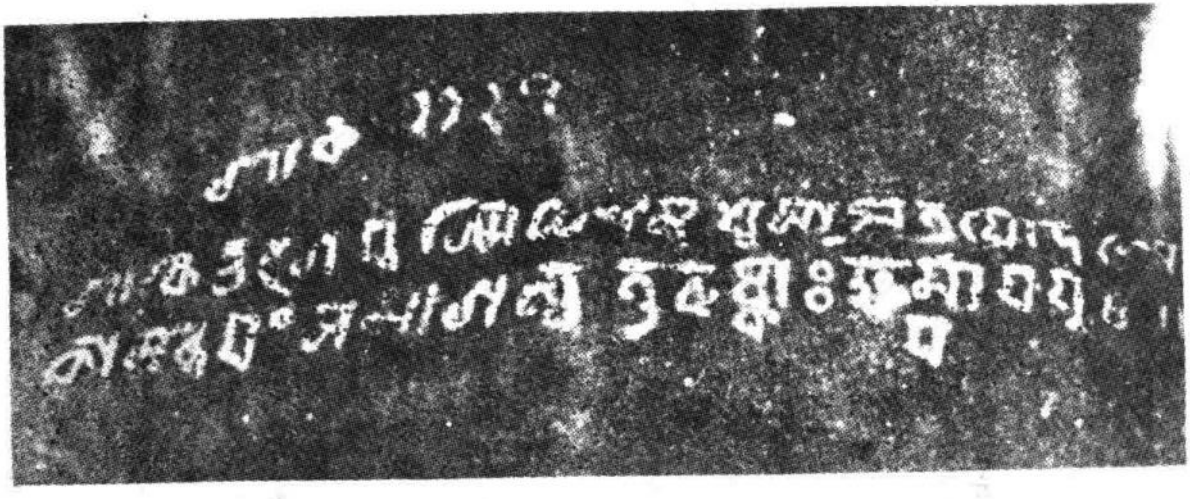

কানাই বড়শী শিলালেখ, ১১২৭

শাকে ১১২৭

শাকে তুরুযুগোষে মধুমাস ত্রয়োদশে কামরুপং সমানত্যা তুরুস্টা ক্ষয়মায়খু। বাংলা হরফে সংস্কৃত শিলা লেখ। বাংলা রূপান্ত ১১২৭ শবের ১৩ চৈত্র তুরস্কীয়গণ কামরূপে এসে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল।

১১২৭ শব/ ১২০৫ খ্রীস্টাব্দে। দ্রষ্টব্য ভি,আর,এম ভলুম-৪ নং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ

*পরিশিষ্ট-১*

# নদীয়া কোথায়?

প্রচলিত বিশ্বাস মতে, প্রথম গৌড় বিজয়ী মুহম্মদ বিন বখ্‌ত ইয়ার খালজী বিজিত নওদিয়া/ নদীয়া কোথায়? কথিত আছে, বখ্‌ত ইয়ার খালজি প্রথমে মাত্র সতেরো জন ঘোর সওয়ার সমন্বয়ে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে তৎকালীন গৌড় নগরী জয় করে একটি স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন (৬০০হিঃ/ ৬০০বাং/ ১২০৩-৪ খ্রী ঃ)।

গৌড়ের মহারাজ লক্ষণ সেন পরাজিত ও বিতাড়িত হয়ে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে, মতান্তরে শাখনাতে গমন করেন আর ফিরে আসেন না। পক্ষান্তরে, বখ্‌ত ইয়ার গৌড়ের নওদিয়া বা নদীয়া নামক রাজধানী ধ্বংস করে পার্শবর্তী গঙ্গারামপুর নামক স্থানে অস্থায়ী রাজধানী স্থাপন করে রাজ্য শাসন করতে থাকেন।

সাধারণ বিশ্বাস অনুযায়ী স্থানটি নদীয়া/ নবদ্বীপ নামে পরিচিত। কিন্তু সম্প্রতি প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, নদীয়া-নবদ্বীপ নয়, বখ্‌ত ইয়ার নওদিয়া/ নওদা নামক স্থানে অভিযান করে গৌড় রাজ্য অধিকার করেন । রাজা লক্ষণ সেন সপরিষদ নদী পথে রাজধানী পরিত্যাগ করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফিরিস্তা (আবুল কাসিম) তাঁর বিখ্যাত তারিখ-ই ফিরিস্তা গ্রন্থে লিখেছেন যে, বখ্‌ত ইয়ার নওদিয়া নামক স্থান আক্রমণ ও ধ্বংস করে অন্যত্র রাজধানী স্থাপন করেন। ফিরিস্তার ভাষায়ঃ "দর সরহদে বাঙ্গালা দর এওজে শাহরে নওদিয়া শাহরে মওসুম বে-রঙ্গপুরে বেনা কারদা দারুল মূলক খুদ সাকৃত" (দ্রঃ তারিখ-ই-ফিরিস্থা। নওল কিশোর প্রেস, লাহোর ১৯০৫। পৃঃ ২৯-৩৩। লাইন-২২-২৬)।

বাংলা অর্থ- বাংলার সীমান্ত এলাকায় নওদিয়া শহরের বদলে (খালজী বখ্‌ত ইয়ার) রঙ্গপুর নামক একটি শহর বানালেন এবং এটি নির্মিত হল তাঁর ক্ষুদ্র রাজধানী রূপে।

বর্তমান রঙ্গপুর জেলার মাহীগঞ্জ নামক এলাকায় এই রংপুর শহরের ধ্বংসবশেষ বিদ্যমান। কিন্তু সেই নওদিয়া কোথায়?

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় অবশ্য 'নওদিয়া'র বদলে নদীয়া নবদ্বীপ

নামে একটি কাল্পনিক রাজধানীর নাম উল্লেখ করেছেন, অদ্যাবধি এই নামটিই বহাল আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি কোন সুনির্দিষ্ট স্থানের নাম উল্লেখ করতে পারেননি। এমনকি এমন কথাও কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন যে, বখ্‌ত ইয়ার তাঁর রাজধানীর কোন সুনির্দিষ্ট ভিত্তিই দিতে পারেননি। পক্ষান্তরে, ঐতিহাসিক ফিরিস্তা সঠিক অবস্থানের কথাই উল্লেখ করেছেন।

স্থানটি বর্তমানেও নওদা/নওদিআ নামেই পরিচিত। বর্তমান নওয়াবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলায় নওদা অবস্থিত রয়েছে। স্থানটি নওদার বুরুজ (Watch Tower) নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক ডক্টর আহমদ হাসান দানী যথার্থই বলেছেন,"Nudia a fortified place to be identified with the ruins of Naodah near Rohonpur at the junction of Mohanonda and Punarbhaha about 16 miles of south east of Gour." অর্থাৎ স্থানটি আধুনিক গৌড় থেকে ১৬ মাইলের মধ্যে দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। 'গৌড় রাজমালার' লেখক রমাপ্রসাদ চন্দও লিখেছেন- 'লক্ষ্মণ সেনের অপর রাজধানী মিনহাজ উদ্দীন কর্তৃক কথিত নোদিয়হ হইয়া থাকিতে পারে (দ্রঃ মুহম্মদ আবু তালিব, উত্তর বঙ্গে সাহিত্য সাধনা (উদ্ধৃত)। রাজ, ১৯৭৫, পৃঃ ৪৯)। এই 'নোদিয়হ' নিশ্চয়ই রাজধানী নদীয়া নয়, আলোচ্য 'নওদহ'/ নওদা হতে পারে। এখানে সমকালীন ইতিহাস থেকে আলোচ্য নওদা/ নওদার বুরুজের অবস্থান সংশ্লিষ্ট সমকালীন গৌড়ের মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

উল্লেখ্য, রামাঞি পন্ডিতের তথাকথিত শূন্যপুরাণ কাব্যে এরই ইশারা মিলছে। সম্ভবতঃ তিনি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। শূন্যপুরাণে নওদহ/ নওদিআ নাম না থাকলেও নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলছে। যেমন ঃ

"জাজপুর পুরবাদী ষোল সঅ ঘর বেদী
বন্ন লয়ে করয় নগুন।
দক্ষিণা মাগিতে যাঅ যার ঘরে নাহি পাঅ
সাপ দিয়া পুড়ায় ভূবন।
মালদেহে লাগে কর নচিনে আপন পর
জালের নাহিক দিশ পাস।
বলিষ্ট হইল বড় দশবিস হৈয়্যা জড়
সদ্ধর্মীরে করব বিনাশ।।
বেদ করে উচ্চারণ বেরঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সভয় কম্পমান।
মনেত পাইয়া মর্ম সবে বোলে রাখ ধর্ম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্রাণ।

এই রূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহারণ
ই বড় হইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম্ম মনেত পাইয়া মর্ম্ম
ময়াত হইল অন্ধকার" ইত্যাদি।

শেষোক্ত অন্ধকার স্থলে খন্দকার পাঠও মিলছে। পাঠটি কৌতুহলজনক। খন্দকার পারসী শব্দ, অর্থ- ইসলাম বিষয়ক প্রচারক, মতান্তরে অধ্যাপক। বখ্‌ত ইয়ারের গৌড়বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান অধ্যাপকদের ইসলাম প্রচারের ফলে যুগ যুগান্তরের জমাট অন্ধকার বিদূরিত হল। কারণ, ইসলাম হল আলো এবং কুফরী (অজ্ঞতা/ অন্ধকার)।

শূন্যবাদী (নৈরাকের একেশ্বরবাদী) কবি স্পষ্টই দেখতে পেলেন, বখ্‌ত ইয়ারের আগমণে যুগ যুগান্তের অন্ধকার বিদীর্ণ করে ইসলামী সভ্যতার জোয়ার প্রবাহিত হতে শুরু করেছে।

কবির ভাষায় ঃ

"নিরঞ্জন নৈরাকার হৈল্যা ভেস্ত অবতার
মুখেত বায় দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ সবে হয়্যা এক মন
আন্দেত পরিল ইজার।।

দম্বদার মাদার পীরের ধ্বনি। ভেস্ত অবতার-বিহিশতির আগন্তুক। হজরত শাহ মাদারের আবির্ভাব কাল-১৩১৩-১৪৩৪ খ্রী.অ.)

ইতিপূর্বেই রাজশাহীর হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (১২৮৯-১৩৩১), সিলেটের হজরত শাহজালাল মুজার্রাদের (১৩০৩ খ্রীঃ) ইসলাম প্রচার কাহিনীর তথ্য মিলছে।

শূন্যপুরাণে আরও মিলছে-

"ব্রহ্মা হৈল্যা মহামদ/ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল্যা শূলপাণি"।
গনেশ হৈলা গাজি কার্তিক হৈলা কাজি
ফকির হইলা যত মুনি।।
ত্যজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা শেক
পুরন্দর হইলা মলানা।
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে পদাতি হইয়া সেবে
সবে মিলি বাজায় বাজনা।।

আপুনি চন্ডিকা দেবি তিঁহ হৈল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হৈল্যা বিবি নুর।
যতেক দেবতাগন সবে হৈয়্যা এক মন
প্রবেশ করিলা জাজপুর।" ইত্যাদি

এই জাজপুর কোথায়, আমাদের জানা নেই। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন, এটি উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত। তবে কবি বলেছেন, সকল দেবতাগণ (ব্রাহ্মণগণ সহ) 'এক মন' হয়ে জাজপুরে প্রবেশ করলেন। তাই বলতে বাধা নেই, এখানেই সম্ভবতঃ গৌড়ের রাজধানী ছিল। আমরা আরও জানি, এখানেই রাজা লক্ষ্মণ সেনের একটি রাজধানী ছিল (বিজয়পুর), মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে, তার নাম হয়েছিল- 'লখনৌতী' (লক্ষ্মণাবতী)।

অন্যত্র কবির আরও একটি উক্তি-

" দশম মূরত বুলালে জগন্নাথ।
নিমের পৃতীম সোরন্নের দুটি হাত।
হিঁদু মুছুলমান তোথা এক ছত্র করিয়া
আপুনি জানান প্রভু জানান জানিআ।
হাতে লিলে তির কামঠা পায়ে দিলে মজা,
গৌড়ে বোলান দিয়া ধর্ম্ম মহারাজা।।"

এই দশম মূরত কে?

সম্ভবতঃ দশম মূরত হল- কলির অবতার (জগন্নাথ)। মানে, মুসলমান অবতার 'মহামদ'। ইনিই কল্কি, (কলিযুগের অবতার) /(ব্রহ্মা/জগন্নাথ)। হাতে 'তীর-কামান', পায়ে 'মজা' (মোজা)। মানে, গৌড়ের নব প্রতিষ্ঠিত রাজা (খালজী বখ্ত ইয়ার!) ইনি যবনাবতার। ইনি সম্ভবতঃ 'মুহম্মদ' নন-মুহম্মদের প্রতিনিধি। অধিষ্ঠান-গৌড়, নওদিয়া।/নদীয়া। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বলা যায়, নওদা-নদীয়া (পূনর্ভবা-মহানন্দার মোহনায়)। আগেই সে কথা বলা হয়েছে।

স্থানটি অতীতে মগধ রাজ্যের (বিহার) অন্তর্গত ছিল। অধুনা এটি নওয়াবগঞ্জ জেলার (সাবেক মালদহের) অন্তর্গত। সম্প্রতি ভারত বঙ্গের (পশ্চিম দিনাজপুরের) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বখ্ত ইয়ার বিজিত গৌড় রাজ্যের রাজধানী এই এলাকার গঙ্গারামপুরে (বাণগড়ের সন্নিকটে) অবস্থিত রয়েছে। বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষও অদ্যাবধি বিদ্যমান। মহাভারত বর্ণিত প্রাচীন বাণ রাজার গড় ও দিঘি এই এলাকায় অবস্থিত। তারই পাশে বখ্ত ইয়ারের অধিষ্ঠান (গঙ্গারামপুর)। একটি কথা আমরা ভুলে যাই, বখ্ত ইয়ার খালজী গৌড় জয় করেছিলেন এ কথা সত্যি,

কিন্তু কেন করেছিলেন ? কি ভাবে করেছিলেন, এ কথা আমরা বলতে ভুলে যাই /বখ্‌ত ইয়ার কি স্বেচ্ছাচারী শাসক ছিলেন? আলোচ্য শূন্যপুরাণ থেকেই জানা যায়, জাজপুর-মালদহের নির্যাতিত বৌদ্ধ জনগণের কাতর ক্রন্দনে অতিষ্ঠ হয়ে স্বং নৈরাকার নিরঞ্জন বখ্‌ত ইয়ার খালজীকে নির্যাতিত দেশবাসীর উদ্ধারের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। শুধু তাই নয়, নিরঞ্জন স্বং তার আনুকূল্যও করেছিলেন। ফলে অত্যাচারী ব্রাহ্মণ রাজাকে অসহায় অবস্থায় পলায়ন করতে হয়েছিল। তাই বিন বখ্‌ত ইয়ারকে স্বাভাবিকভাবেই কোন বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়নি। এভাবে গৌড় বিজিত হল।

উল্লেখ্য, সমকালীন ব্রাহ্মণ ধর্ম বলতে কিন্তু আধুনিক হিন্দু ধর্ম বুঝায় না। ব্রাহ্মণ্যবাদ বলতে তখন এক নৃশংস অত্যাচারী মানবতা-বিরোধী সম্প্রদায় বুঝাতো। এদেরই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্বয়ং নিরঞ্জন যবন (মুসলমান) নামক এক বহিরাগত জাতিকে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুহম্মদ বিন বখ্‌ত ইয়ার ছিলেন তাদের প্রতিনিধি। বিন বখ্‌ত ইয়ারের নেতৃত্বে মুসলমানদের এই বিজয় ছিল দেশবাসীর জন্য এক আশীর্বাদ। শুধু তাই নয়- তার এ বিজয়ে দেশবাসী জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এতই পুলকিত হন যে, ব্রাহ্মণ রাজের পলায়নের সময় দেশবাসিগণ একটু আহা উহুও করেনি। এমনকি তাদের বিদায়ে একটি শোক কবিতা বা ছড়াও রচিত হয়নি। পক্ষান্তরে আক্রমণকারী যবন রাজার বন্দনায় শূন্যপুরাণ রচিত হয়েছে।

আসলে শূন্যপুরাণ কোন পুরাণ বা শাস্ত্র-কাহিনী নয়, পুরানো কথা। রামাঞি পন্ডিতের 'আগম পুরাণ' নামে মুসলমান রাজার আগমনী গানই হল শূন্যপুরাণ। আগম পুরাণ অর্থ মানব সৃষ্টির আদ্য কথা/ আগম অর্থ- শিব যা বলেন, উমা/ দুর্গা যা শোনেন এবং বাসুদেব (শ্রী কৃষ্ণ) যা সমর্থন করেন এটি হিন্দু দর্শনের কথা বলতে বাধা নেই, কলিযুগের অবতার হিসেবে বখ্‌ত ইয়ারের বন্দনা গান রচিত হয়েছে। তাই তার ভাষাও হয়েছে মুসলমানী/ মানে আরবী ফারসী সমৃদ্ধ। তাই দেখা যায়, শূন্য নিরঞ্জনের মুখে ফারসী 'দস্বদার' ধ্বনি এবং ব্রাহ্মণদের পরিধানে মুসলমানী ইজার (পাজামা) পরিশোভিত।

পক্ষান্তরে বাংলা ভাষায় হলেও মুসলমান বাদশাহকে গৌড়েশ্বর, দিল্লীশ্বর ইত্যাদি সম্বোধনও নিতান্তই বেমানান। শুধু তাই নয়- কবি ভারত চন্দ্র দিল্লীর বিখ্যাত মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরকে নিয়ে অত্যন্ত ন্যক্কারজনক রসিকতার খোরাক যুগিয়েছেন (অন্নদা মঙ্গল)। কবি বিজয়গুপ্ত তথাকথিত মনসা মঙ্গল (দেবতা বন্দনায়) কবিতায় মহান বাঙালী সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহকে দিয়ে মনসা-পূজার পাঠ পড়িয়েছেন। যা আদৌ শোভনীয় নয়। একালের পাঠকগণ হয়ত জানেন না, মক্কা-মদীনার মুসলিম সমাজের নয়ন মণি হযরত ফাতেমা নন্দন

হাসান-হোসেন নাম দিয়ে ইসলাম বিরোধী চরম বেআদবীপূর্ণ কাব্য লিখেছেন- বিপ্রদাস পিপ্পলাই। আগম পুরাণের কবি রামাঞি কিন্তু যথার্থই বলেছেন, সমকালীন নাথ- সদ্ধর্মীরা অত্যন্ত সশ্রদ্ধভাবেই এই পরিবর্তন গ্রহণ করেছিলেন এবং হিন্দু ব্রাহ্মণদের মধ্যেও এক শ্রেণীর লোক একে গ্রহণ করতে আনন্দবোধ করেছিলেন। শূন্য পুরাণে তাদেরই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে পলায়নপর সেন রাজের সঙ্গীগণও এ ব্যবস্থা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর মনে করেনি। কিন্তু আমাদের ইতিহাসবেত্তাগণ বাস্তব ইতিহাসকে মেনে নিতে দ্বিধা করেছেন। আরও কৌতুহলের ব্যাপার বাঙালী কবিগণ মুসলমান বাদশাহদের নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছেন। তারাই আবার তাকে দেব অবতার গৌড়েশ্বর, দিল্লীশ্বর বলে পূজা দিতে কার্পণ্য করেননি। ঈশ্বর কি পথে ঘাটে মেলে? উনিশ শতকের সাহিত্য সম্রাটগণ তো এই ইতিহাসকে অবাস্তব, ভুতের গল্প বলে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি অবাঙালীর লেখা ইতিহাসকে, এমনকি ইংরেজ ঐতিহাসিকদের বিবরণও এই বলে অস্বীকার করেছেন যে, যে ইতিহাস অবাঙালীর লেখা তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

পক্ষান্তরে বাঙালী হিন্দুদের লেখা কোন ইতিহাসই নেই। ঐতিহাসিক রাখালদাস মিনহাজের সূত্র ধরে এক অবাস্তব কল্পনার আশ্রয় নিয়ে বলেছেন, ফিরিস্তার ইতিহাস মানতে হলে মনে হয়, শুধু গৌড় বঙ্গ নয়, বখ্‌ত ইয়ারের গৌড় বিজয়ের ফলে আগামী তিন শতকের মত পূর্বভারত এমন আঘাত পেয়েছিল যে, সে দেশ থেকে সাহিত্য, সংস্কৃতি এমনকি প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা তার সে বিপর্যয় থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়নি, তার সামান্য মাত্র পুর্নগঠনের মুখ দেখেছিল খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে। বলা বাহুল্য, এই সময়ে বাঙালী হিন্দুদের পুনর্জাগরণের যুগ। অথচ বখ্‌ত ইয়ারের সঙ্গী ছিল মাত্র সতেরো জন তালোয়ারধারী সৈনিক মাত্র, যারা নিতান্তই বহিরাগত। রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বিষয়টি হল-

The Shock of Mohammadan Conquest Paralised Eastern India, from which it never recovered entirely. The blow staunded literature, prevented its growth during the first two centuries after the conquest, and a hartial revival was made in the 15th Bengale"

(Vide: Rakhaldas, Banerjce Origin of scirpt; 1919 p.5)

এটি কি করে সম্ভব হতে পারে?

এর সদুত্তর খুঁজতে গেলে রামাঞি পন্ডিতের আগম পুরাণের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। রামাঞি সকল ধর্মমতকে এক করে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিকোণ শিশুতোষ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। মূর্তি আর মানুষ কি এক হতে পারে?

পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টি অতি স্বচ্ছ। রামাঞি পন্ডিত যথার্থই লক্ষ্য করেছেন, বিষয়টি নেহায়েৎ "দৈব ঘটনা ব্যতীত নয়। নিরঞ্জনের 'দম্বদার' ধ্বনিসহ আক্রমণকারী রাজার সমর্থনে এগিয়ে আসাকেই তার প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বখ্‌ত ইয়ারকে আধুনিক যুগের এক নবীন অবতার রূপে (যবনাবতার) দেখেছেন। যে নবীন সাম্যবাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতি সেদিন বাঙালীরা লাভ করেছিল, তারই সর্বগ্রাসী প্লাবনে পূর্বভারত কেন, সমগ্র প্রাচ্য জগৎ সভ্যতায়/ ও সংস্কৃতিতে কাঁপন ধরেছিল, যার পুনর্গঠন আজও সম্ভব হয়নি। সেদিনের সেই ব্রাহ্মণ্য নির্যাতনের কংসকারা থেকে বাঙালী জাতির আত্মরক্ষার আর কোন উপায় ছিল কি? সুধী সমাজের অবগতির জন্য সুদূর অতীতের আরও একটি ঘটনার কথা বলি, যার ফলে বিশ্বে ইসলামী-সভ্যতা ও সংস্কৃতির আগমণ ও অনুরূপ বিজয়ের আভাস মেলে। বখ্‌ত ইয়ারের বিজয় তারই একটি ধারা মাত্র।

এখানে নজরুল ইসলামের 'উমর ফারুক' কবিতার অংশ বিশেষ উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা যাচ্ছে। উমর ফারুক ছিলেন ইসলাম জগতের দ্বিতীয় মহাসন্মানিত খলীফা। কবিতাটি তাঁরই দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে। ইসলামের দৃষ্টিতে অবতার নয়, যুগমানব (নবী-পয়গম্বর) আসেন। তার পরেই আসেন 'মুজাদ্দিদ'/ সংস্কারক। হযরত উমর ছিলেন তার মধ্যবর্তী (রসুল সঙ্গী)।

তুং কবি নজরুল ইসলামের ভাষায় ঃ

"উমর ফারুক আখেরী নবীর ওগো দক্ষিণ বাহু,
আহবান নয়, রূপ ধরে এসো গ্রাসে অন্ধতা রাহু।
ইসলাম রবি জ্যোতি তার আজি দিনে দিনে বিমলিন
সত্যের আলো নিবিয়া জ্বলিছে জোনাকীর আলো ক্ষিণ।
অঙ্গুলি হেলনে অধেক জাহান শাসিতে এ জগতের,
দিয়াছিলে ফেলি মোহাম্মদের চরণে যে শমশের।
ফিরদৌস হতে নেমে এসো আজি সেই শমশের, ধনি,
লোহিত সাগরে আর একবার লালে লাল হয়ে মরি।"

ইতিহাসের দিক দিয়েও হিন্দু-মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ইশারাও মিলছে এখানে। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, ইসলামে পুনর্জন্মবাদ নেই। তাই স্বর্গ থেকে নেমে আসার প্রশ্নও অবান্তর। আর যেহেতু অবতারও ইসলামে অকল্পিত তাই মুহম্মদের চরণে ফেলে দেওয়া শমশের হাতে উমরের আগমণ ইসলাম-বিরোধী কল্পনার কথাও আসে না।

বখ্‌ত ইয়ারের তলোয়ারও তাই। মুসলিম সাহিত্যে রূপক প্রতীকের ব্যবহার অবান্তর নয়, তবে ইসলামী চেতনার সঙ্গে তার সাযুজ্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

উল্লেখ্য, সংস্কৃত মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত তুঙ্গল নাগ/ (নাগ যষ্ঠী) ও 'কলমা

সাদা'র প্রসঙ্গে এসেছে। তুলনায় আল কুরআনের বা বাইবেলের হযরত মুসার আসা/ যষ্ঠী। তাই বলে তাকে এক কথায় মুসলমানী বলা যাবে না। কারণ চিন্তা-চেতনায় বেদ-বাইবেল-কুরআনের মধ্যে আজ বিস্তর ব্যবধান রচিত হয়েছে।

তাই আজ মুসার আসা আর হযরত উমরের বা বখ্‌ত ইয়ারের তলোয়ারে সাযুজ্য থাকলেও শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনের সঙ্গে হযরত মুসা-হারুণের সাযুজ্য টানা মুশকিল হয়েছে। বলা বাহুল্য, আদিতে সকল ধর্মেই সাযুজ্য লক্ষণীয় ছিল। সত্যের অনুরোধে এ কথা বলতে হবে। বিভেদ ঘটেছে পরবর্তী যুগে (কু/৪৩ ঃ ২১-২২)।

## *পরিশিষ্ট-২*

# রূপক ব্যাখ্যা

আমার কথা ফুরিয়ে এসেছে।

পরিশেষে তাই বৌদ্ধ ও হিন্দু বিশ্বাসে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে কিছু আলাপ করা প্রয়োজন মনে করি।

হিজরী ৬০০/বাংলা ৬০০/ই ১২০৩ অব্দে খালজ মালিক মুহম্মদ ই-বখ্‌ত ইয়ার খালজীর বঙ্গবিজয়ের পর পৌত্তলিক ভারত বিশেষ প্রমাদ গণে। কারণ এই বিজয়ের ফলে দলে দলে নাথ সদ্ধর্মিগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। সঙ্গে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বিগণও ইজার পরে তাদের সামিল হয় বলে দ্বিজ রামাঞি তার শূন্য পূরাণে উল্লেখ করেছেন। যেমন,

"নিরঞ্জন নৈরাকার হৈল্যা ভেস্ত অবতার
মুখের বলয় দম্বাদার।
যতেক দেবতাগণ সবে হৈয়্যা একমন
আনন্দেত পরিল ইজার।

নিরঞ্জন নিরাকার-এক আল্লাহ্ প্রতীক। ভেস্ত অবতার মানে, বেহেশতের (আগন্তুক) ফিরিস্তাগণ ইসলাম মতে, নবী/রসূল হিন্দু মতে, অবতার/ সাকার ভগবান। যুগে যুগে স্বরূপ ধারণ করে এসে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন। (তুং সম্ভবামী যুগে যুগে- মদ্ভাগবত। পক্ষান্তরে ইসলাম মতে, আল্লাহ্ আকার আকৃতিবিহীন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনিই একমাত্র কর্ত্তা। হিন্দু মতে স্রষ্টা একধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর মূর্তিতে (সাকার) দুনিয়া শাসন করেন। (ত্রিমূর্তি

অ+উ+ম= ওঁ/ ওম তৎসহ)। এটি নিতান্তহ শিশুতোষ রূপকমূর্তি। কিন্তু মুসলমানী মতে, এটি শির্ক/ শেরেকী অর্থাৎ কুফুরী। মহা গুণাহের কাজ।

কিন্তু কবি বলেছেন, ব্রাহ্মণগণ দলেদলে ইজার/ পাজামা পরে ইসলামের শামিল হয়েছেন। এমন কি স্বয়ং নিরঞ্জন ঠাকুর 'দম্বদার' (দম-ই-মাদার) ধ্বনি করেছেন। শাহ মাদার একজন মুসলমান পীর।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবও তাই বলেছেন। কিন্তু তা কি হতে পারে? হযরত বদী উদ্দীন শাহী-ই মাদার (ওফাত ২৭ ডিসেম্বর ১৪৩৪ইং খ্রী,) তাই যদি হত তা হলে এ গ্রন্থের অন্যত্র যে বলা হয়েছে-

দশম মুরত সৃজিলা জগন্নাথ
নিমের পৃতীম সোর্বন্নের দুটি হাত।
হিঁদু মুছুলমান তোথা একচ্ছত্র করিয়া
আপনি জানান প্রভু জানান জানিআ।
হাতে লিয়ে তীর খামটা পায়ে দিয়ে মজা
গৌড়ে বোলান গিয়া ধর্ম মহারাজা।

শেষের অংশে অবশ্য 'হাতে তীর খামটা' ও পায়ে মজা (<ফা-মোজা) দেওয়া ধর্ম মহারাজার চিত্রটি ঠিকই গৌড় সুলতান 'মুহম্মদ-ই বখ্ত ইয়ারের মতই মনে হয় কিন্তু একজন মুসলমান কি মস্তকহীন' নিম কাঠের প্রতিমা এবং শ্রীকৃষ্ণের (দশম মূর্তি) হতে পারেন। ঈশ্বর ও আল্লাহ অর্থে এক মনে করা হলেও তাদের মধ্যে আসমান জমীনের ফারাক।

এখানে ঈশ্বর নিতান্তই হিন্দুয়ানী শিশুতোষ মূর্তি মাত্র (নাউজুবিল্লাহ)। উল্লেখ্য, এই মূরত, আরবী 'সুরাত' এর মত শুনায়।

বলতে বাধা নেই এখানে বখ্ত ইয়ার বা কোন মুসলমান রাজা মহারাজা নন হিন্দু দেবতা শ্রীকৃষ্ণর মানবরূপে আগমনের কথাই (দশম মুরত) অভিব্যক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে, কথাটি আদিতে অন্যরূপ ছিল। অর্থাৎ মৌলিক অর্থে সকল ধর্মেই আল্লাহ নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ ছিল। শুধু তাই নয়, এর পর থেকে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু কবিগণ মুসলিম বাদশাহগণকে 'দেব অবতার নৃপ'ও বলেই স্মরণ করেছেন এবং সেভাবেই আচার আচরণ প্রকাশ করেছে। যেমন, কবি যশোরাজ খান বলেছেন-

"শ্রীযুত হুসন জগৎ ভুষণ।
সেহ-ই এই রস জান
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর
ভণে যশোরাজ খান।

যশোরাজ খান সুলতান হোসেন শাহের সভাকবি ছিলেন। তবে বিশ্বাসে এক ছিলেন না। অর্থাৎ এ ভাষা তাই মুসলমানের (বাংলা) ভাষা হতে পারেনা। অথচ কৌতুহলের ব্যাপার, হোসেন শাহের পূর্ববর্তী সুলতান, রুকনউদ্দীন বরবক শাহের সভাকবি মালাধর বসু কিন্তু তার বিখ্যাত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, (মদ্ভাগবতের অনুবাদ) কাব্যে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, মদ্ভাগবত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার থেকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে মুসলমানী নবীর সামিল।

"প্রণামোঁহো নারায়ণ অনাদি নিধান।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় জানো তাহার কারণ।
একভাবে বন্দো হরি জোড় করিহাত
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণ নাথ।
(দ্রঃ শ্রীকৃষ্ণ বিজয়- ১৪০২ শক ১৪৮০ ইং)

এখানে স্পষ্টই শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান নয়-নন্দনন্দন বলা হয়েছে। আর প্রণাম করা হয়েছে, 'অনাদি নিধান নারায়ণকে' যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র অধিকারী।

এখানে স্পষ্টই ইসলাম বিশ্বাসীর আল্লাহ প্রকটিত হয়েছে।

কৌতুহলের ব্যাপার, পরবর্তী ব্রিটিশ আমলেও অনুরূপ উক্তি করেছেন পাবনা জেলার হরপ্রসাদ মৈত্র-

"শুন সবে এক মজা বাঙ্গালার যতেক প্রজা
ছিল সুবেদারীতে প্রধাণ
ইতিমধ্যে কোন ধাতা সৃষ্টি কৈল কলিকাতা
সাহেব রূপে দেবতা অধিষ্ঠান

পূর্ববতন ব্রাহ্মণ্যবাদী কবি মালধর বসু শ্রীগীতায় উক্ত শ্রীকৃষ্ণের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা রীতিমত তৌহীদবাদী চিন্তা চেতনার প্রতীক। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যও সাক্ষ্য দিয়েছেন-

"গুণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়
তাঁহা এক বাক্য তার আছে রসময়।
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ
এই বাক্যে বিকাইলাম তার বংশের হাত"।।

গুণরাজ খান মালাধর বসুর রাজপ্রদত্ত উপাধি। এবার প্রখ্যাত সংস্কৃত কবি জয়দেব গোস্বমীর গীত গোবিন্দ থেকে একটি উদ্বৃতি দিই-

"ম্লেচ্ছ নিবহনিধনে করয়সী করবালং
ধূমকেতুনিভ কিমপি করালং
কেশব, ধৃত কল্কি শরীরে
জয় জগদীশ হরে।।

বাংলা অনুবাদ ঃ

"ম্লেচ্ছ নিধনের তরে আসিয়াছ
খর তরবারি হাতে।
ধুমকেতুসম কল্কির রূপে
আজি তুমি এধরাতে।
হে কেশব (তবু বুঝিতে না পারি,
লীলাতব লীলাময়)
জয় জগদীশ জয় শ্রীহরি
জয় তব জয় জয়।

(দ্রঃ জয়দেব। গীতগোবিন্দ। শ্লোক-১৪)
অনুবাদ- সদর উদ্দীন

এখানে দেখা যাচ্ছে, কেশব, শ্রীহরি, জগদীশ সকলেই একাকার। এবং সম্ভবতঃ এক ও নিরাকার ঈশ্বরের প্রতীক।

কল্কি কিন্তু এখানে ঈশ্বর নন-ঈশ্বরের অবতার। ইসলামের নবী রসূলের সমকক্ষ মনে হয়।

যেমন,

ব্রহ্ম হইলা মহামদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈলা শুলপাণি।
গনেশ হইল গাজি কাত্তিক হৈল্যাকাজি
ফকির হৈলা যথ মনী।

অর্থাৎ ব্রহ্মই মুহম্মদ (নাউজুবিল্লাহ)।

নিতান্তই শিশুতোষ কল্পনা। বিস্তারিত আলোচনার স্থান এ নয়। তবে স্পষ্ট বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়- তৌহিদ আর বহুত্ববাদে (কুরআন ও পুরাণে) আকস্মিক মিল ঘটাতে গিয়ে এই বিপত্তি ঘটেছে। তুং নজরুল ইসলামের উক্তিঃ

"তৌহিদ আর বহুত্ববাদে বেধেছে আজিকে মহাসমর
লা শরীক এক হবে জয়ী কহিছে আল্লাহ আকবর
জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে অন্ধকারের এ ভেদাজ্ঞান,
অভেদ আহাদ মন্ত্রে টুটিবে মানুষ হইবে এক সমান,"
(দ্রঃ মহাসমর কবিতা, মাসিক সওগাত)

এই মহাসমর দুনিয়াব্যাপী আজও চলছে। বসনিয়া হারজেগভিনা, চেচনিয়া, কাশ্মীর ফিলিস্তিন সবই একাকার।

**বাঙ্গালী কবির ভাষায় শেষ করি**

ল শরীক এক আল্লাহ শরীক নাহি নাহি কাল্লাহ
হস্তপদ মুখ নাহি জান।
কহে শুনে বনা মুক্ষে সবাকারে দেখে চৈক্ষে
তাকে নাহি দেখে কোন জন।
সৃজন পালন হার সেহি হয় সবাকার
সে যে নহে কাহার সৃজন
এমন দয়াল সাঁই ত্রিভুবনে কেহ নাই
সবাকারে করিছে পালন।
কবি বোরহানুল্লাহ, নওখৈর দিনাজপুর।

*পরিশিষ্ট-৩*

## যবনাবতার

গত ঈদ সংখ্যা 'পালা বদল'-এ 'বিসমিল্লাহ' নামে আমার একটি লেখা বেরিয়েছে (১৯৯৭)। তাতে আমি এ-কথা বলতে চেয়েছিলাম যে, 'বিসমিল্লাহ'/ আল্লার একটি নাম, যিনি নিরাকার- এক ও অদ্বৈত। আল্লাহর নাম শুধু মুসলমানদের নয় সকল সম্প্রদায়ের -হিন্দু, মুসলমান, য়িহুদী খ্রীষ্টান, এমনকি হিন্দুদের মানিত শাস্ত্র গ্রন্থেরই আদ্য বাণী। ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। কিন্তু নামটি এখন এত ভাবে উচ্চারিত যে কে বলবে একদিন 'আল্লাহ' নামটি সকলেরই মান্য ছিল। তাই বিসমিল্লায় গলদ মানব জাতিরই এক বড় গলদ (গোড়ায় গলদ)। শুধু মুসলমানের কুরআনে নয়- বেদ-বাইবেল পুরাণ সবখানেই আল্লাহ/ সর্বশক্তিমান

নিরাকার এবং একমাত্র স্রষ্টা রূপে স্বীকৃত। বিভ্রান্তি ঘটেছে পরে। মানব জাতির ইতিহাসও তাই। সম্প্রতি লন্ডন থেকে মুহম্মদ দিদাত প্রাচীন বাইবেলের কলমী পুথি থেকে আবিস্কার করেছেন যে, বাইবেলে এই সেদিনও আল্লাহ (Allah) নামটি ছিল। মহামান্য খ্রীস্টান পাদরীদের কল্যাণে সর্বশেষ প্রামাণ্য (Schofield Varsion-F) বাইবেল থেকে তা বর্জিত হয়েছে। শুধু আল্লাহই যে বর্জিত হয়েছে, তাই নয়- খ্রীষ্টান ত্রিত্ববাদও তারাই আমদানি করেছেন এবং সেই সঙ্গে গ্রীকদের বাইবেল থেকেও আল্লাহ বর্জিত হয়েছে। নইলে দুনিয়ার সকল ভাষাতেই আল্লাহ ছিল। ভাবখানা এই যে, এক আল্লাহ কেন সব আল্লাহ'র উপরে কর্তৃত্ব করবেন? এখন আল্লাহর বদলে সকল বান্দাই আল্লাহর গদী দখল করে বসেছে। সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থ থেকে তো বহু কাল আগেই আল্লাহ বিদায় নিয়েছেন। ঈশ্বর, ভগবান ইত্যাদি- হিন্দু শাস্ত্রীয় নাম। এছাড়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী (ইসলামী ভাষায় সিফাত (গুণবাচক) নাম)।

শাস্ত্র গ্রন্থে স্থান পেলেও এগুলো আল্লাহ নয় সাহায্যকারী নাম। তুলনামূলক ধর্ম শাস্ত্র, আলোচনায় দেখা যায়- তৌরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কুরআনে, আল্লাহ নাম বরাবরই বহাল ছিল। হিব্রু ইলাহি- ইলোহিম= আল্লাহ। আল্লাহ আরবী ভাষায় প্রচারিত। তবে সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বদলে একমাত্র নারায়ণকে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার মর্যাদা দেওয়া হলেও পরবর্তী শাস্ত্র গবেষকগণ নারায়ণকে যথাক্রমে নিরঞ্জন এবং সকলের শেষে ঈশ্বর ভগবানকে সর্বশক্তিমান বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অধুনা অবশ্য আল্লাহকে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা হয়। সর্বশেষ ধর্ম গ্রন্থ আল কুরআনে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও বাংলা ভাষায় নারায়ণ নিরঞ্জন আল্লাহর বদলে স্থান পেয়েছেন। কুরআনের বাইরে এখন আর আল্লাহ নাম নেই। আল্লাহ এখন একটি সাম্প্রদায়িক নাম।

কিন্তু বাংলাদেশে ইসলাম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালি কবি দ্বিজ রামাঞি যে 'আগম পুরাণ' কাব্য (সম্পাদক প্রদত্ত নাম শূন্যপুরাণ) রচনা করেন, তাতে দেখা যায়- ঈশ্বর আল্লাহর পাশাপাশি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর যথাক্রমে- মহামদ, পয়গম্বর (পেকাম্বর) ও আদক্ষ নামে বাংলাদেশে নেমে আসেন এবং স্বয়ং নিরঞ্জন ভেস্ত থেকে নেমে এসে গৌড়-বিজয়ী বখ্‌ত ইয়ারকে (যবনাবতার রূপে) বরণ করে নেন। অবতার হল ভগবানের বিশেষ দূত। মুসলমানী মতে-নবী-পয়গম্বর। কবির মতে, বাংলাদেশে জবন নামে এক নবীন জাতির উদ্বোধন ঘটে। এদের আদি পিতা হল অবশ্য মহামদ ওরফে ব্রহ্মা বাংলাদেশের জনগণ ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ও পৌত্তলিক বৌদ্ধগণ খোদার নামে পীর মাদারের ধ্বনি (দম্বদার/ দমই মাদার) দিয়ে 'যবন মহারাজ'কে বরণ করে নেন। ইনিই কি আখেরী জামানার অবতার- যবনাতার? দেশের তথাকথিত হিন্দু-মুছলমানগণ নিম কাঠের এক প্রতিমা গড়ে পূজা দিতে থাকেন। কবি বলেন, এদিন থেকে হিন্দু আর হিন্দু রইল না, মুসলমান

আর মুসলমান রইল না- হল 'যবন' নামে এক নবীন জাতি। তার রাজা হলেন মস্তকহীন নিম কাঠের মূর্তি দেবতা, যার সোনার হাতে তীরকশ কামান ও পায়ে মুসলমানী মোজা শোভমান হল। সম্ভবতঃ এখান থেকেই এ দেশে ধর্ম নিরপেক্ষতার দোহাই শুরু হল। কবি বললেন, গৌড় দরবারে তিনি 'বার' দিলেন এবং তার নাম 'ধর্ম মহারাজ' হল (বকরূপী ধর্ম ঠাকুর? মহাভারত)। এই হল 'আগম পুরান তথা বাঙালী জাতির' নয়া পুরাণ। অবশ্য কবি তাঁর কাব্যে 'বাঙালি' নামটি আদৌ উচ্চারণ করেননি। মহারাজা হিসেবেই তিনি চিহ্নিত হয়েছে। এই মহারাজ আবার বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর/ গৌড়েশ্বর হলেন। এই জাতির আদ্য কাহিনী হল শূন্যপুরাণ। রচয়িতা দ্বিজ রামাঞি। কাব্যখানির আদ্য অধ্যায়ের নামও হল কলিমা জাল্লাল/ রুদ্র বাক্য। কার বাক্য? নিরঞ্জন/ আল্লাহর। "শূন্যপুরাণ' কার রামাঞ্চির ভাষায় তিনি হলেন-

"দশম মূরত বুলালে জগন্নাথ।
নিমের পৃতীম সোবন্যের দুটি হাত॥" ইত্যাদি।

মূরত অর্থ মূর্তি। আরবী-সুরাত? ইনিই যবন দেশ/ গৌড় বাংলার 'ধর্ম মহারাজা'। কবি বৌদ্ধ তাই নিরাকার আল্লাহকে নিরঞ্জন ভেবেছেন। সম্ভবতঃ ইনি মহাভারতের দশম মুরত (মূর্তি), নামান্তর 'জগন্নাথ'। তাঁর বাক্যটিও 'জয় জগন্নাথ' (তুং আল্লাহু আকবর) সম্ভবতঃ কবি মনে করেছেন- হিন্দু মতে দশম অবতার (শ্রীকৃষ্ণের বাঙালী রূপ) তিনি স্বয়ং এসেছেন। যেমন ভগবান যুগ যুগে আসেন। হিন্দু পুরাণে ইনি কল্কি (শেষ অবতার)। ইনি জগন্নাথ নামেও পরিচিত- শূন্যপুরাণে এই জগন্নাথেরই রূপান্তর। শূন্যপুরাণে একে মহামদ/ মুহম্মদ বা ব্রহ্মা হয়েছে। যা নিতান্তাই উদ্ভট।

মুহম্মদ ইসলামের শেষ নবী।

যথা- "ব্রহ্মা হৈল্যা মহামদ
বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল্যা শূলপানি।" ইত্যাদি।

তুং বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। সং সত্যম শিবম সুন্দরম। মানে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এখন আর স্বয়ং ভগবান নন- ভগবানের দূত- মানুষ মাত্র। সম্ভবতঃ গৌড়ে মুহম্মদ-ই-বখ্‌ত ইয়ারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এ দেশের মুক্তিকামী মানুষ মুক্তিদাতা (Saviour) হিসেবে তাঁকে বরণ করে নেয়। তারি নাম যবনাবতার। যবনাবতারের এই মূর্তি প্রতিষ্ঠাই তার সাক্ষ্য বহন করছে। কবি হয়ত ভাবতেও পারেননি যে, আল্লাহর কোন মূর্তি হয় না।

সম্ভবত ঃ কুরআন সর্বশেষ ধর্ম গ্রন্থ হওয়ায় তার ভাষাকে অর্বাচীন বলে বর্জনের এই প্রয়াস। যা যথার্থ নয়। কুরআন কোন অভিনব বাণী নয়। বরং সর্বশেষ বলে পূর্বতন সকল বাণীরই পরিণতি ঘটেছে কুরআনে।

উল্লেখ্য, আদ্যের হিন্দু পুরাণের বাণী, সরস্বতী/ বাগ্বেবী ও মূর্তি বিহীন ছিল। শূন্য পুরাণ কাব্য তাই বাংলাদেশে মুসলিম অধিকারের এক মাইল ফলক বলা যেতে পারে। একটি মুসলিম বিজয়ের পুরাণ কাহিনী।

কবি বহুত্ববাদী বৌদ্ধ হলেও তার পূজিত শূন্য নারায়ণের সঙ্গে মুসলমানদের নিরাকার আল্লাহ, ইসলামী সাম্য ও মৈত্রী মন্ত্রের সৌসাদৃশ্য থেকেই তিনি গৌড় বঙ্গের ভবিষ্যৎ পুরাণ কল্পনা করতে পেরেছেন মনে হয়। তাঁর ভাষাতেই শেষ করা যায়-

"নিরঞ্জন নৈরকার হৈল্যা ভেন্ত অবতার
মুখেত বলয় দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ সবে হয়্যা এক মন
আনন্দেত পরিল ইজার॥

অর্থাৎ মুসলমান বিজয়কে তারা সানন্দে বরণ করে নিলেন। বর্তমান বাংলাদেশ তারই উত্তরাধিকার (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ)। তবে মনে রাখতে হবে মুসলমান বিশ্বাসে পৌত্তলিকতা অনুপস্থিত। কারণ, ঠুঁটো জনগ্নাথের ধারণা ইসলামে অচল।

তুং রবীন্দ্রনাথের 'রথ যাত্রা'-

"রথ যাত্রা লোকারম্য মহাধুমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব রথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে আমি দেব হাসে অন্তর্যামী।"
তুং 'কালের যাত্রা' নাটক-রবীন্দ্রনাথ।

এখানে জগন্নাথই রথের মালিক, পরম স্রষ্টা। আর "সত্যের আগমনে মিথ্যার বিলয় অবশ্যম্ভাবী।' -কুরআন।

দ্বিতীয় খন্ড

# মুসলমানী কথা

(আল্লাহ বিশ্বাসীর উপহার)

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

# প্রসঙ্গ কথা

নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্নব রামাঞি পন্ডিতের রচনা বলে কথিত 'শূন্যপুরাণ' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুঁথি সম্পাদনা করেন ১৩১৪/১৯০৭। তার কলিমা জাল্লাল'/কালিমা-ই-জালাল নামক অধ্যায়ে সমকালীন বাংলা দেশের একটি কৌতুহলজনক বিবৃতি পাওয়া যায়। পন্ডিতদের অনুমান, এই উদ্ধৃত অংশটিতে বাংলায় মুসলিম অভিযান ও গৌড়বঙ্গ অধিকারের এবং সেই সঙ্গে এক কাল্পনিক জবন ধর্ম ও জবন জাতির পরিচয় দেবার চেষ্টা আছে। শিরোনাম- 'শূন্যপুরাণ'। তার প্রারম্ভিক অধ্যায়- নিরঞ্জনের রুষ্মা কালিমা জাল্লাল,/কালিমা জালাল (শুদ্ধ উচ্চারণ)/ এটি একটি আরবি বাক্যাংশ, অর্থ-রুদ্র বাক্য ('কালিমা'- বাক্য)/ এতে 'জবন রুপি' এক বিদেশী জাতির প্রতিনিধি কর্তৃক বাংলা দখলের ইশারা আছে। এই জবন রুপি ধর্ম ঠাকুর কে? তার যথার্থ পরিচয় কি? তার সঠিক পরিচয় উদ্ধারই এই নিবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই 'জবন' বা 'যবন'কে বাঙালী মুসলমান বলে বুঝানো হয়েছে। দেশের নাম- জবন দেশ, ভাষার নাম জাবনী। 'যাবনী' বা 'জাবনী মিশাল' বলা হয়েছে। কৌতুহলের ব্যাপার এই যে, ফারসীতে 'যবান' মানেই ভাষা/ মাতৃভাষা। বাংলা ভাষার আসল নামই ছিল 'জবানে বাঙ্গালা'। তবে সাধারণ মান জবন/ মুসলমান রাজা। বাঙালী সুলতানের উপাধিও ছিল, 'শাহে বাঙ্গালা'। কিন্তু এখন কি দেখতে পাচ্ছি? আলোচনা যথাস্থানে করা যাচ্ছে। প্রথমে মূল কাব্য পাঠ দেওয়া যাচ্ছে। নামঃ দ্বিজ রামাঞির 'শূন্য পুরাণ'ঃ

নিরঞ্জনের রুষ্মা/ কলিমা-ই-জালাল' প্রসঙ্গ

কলিমা জালাল অর্থ আল্লাহতায়ালার জালালী (রুদ্র) বাক্য। (স্থান- জাজপুর/ হুগলী (পশ্চিম বঙ্গ) মালদহ সমকালীন বরেন্দ্রভূমি/ বাংলাদেশ)।

# মুসলমানী কথা
## ভূমিকা

খ্রীষ্টীয় তেরো শতকের গোড়ার দিকের কথা। গৌড় বিজয়ী ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খালজী তখন সবেমাত্র ওফাত পেয়েছেন। বাংলার খালজী দরবারে আলী মর্দান খালজী তখন তখতনাশীন (১২১০-১২১২)। পার্শ্ববর্তী কম্বুজ (কম্বোডিয়া) রাজ্য থেকে জনৈক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পন্ডিত ধর্মীয় বিতর্কের (বাহাস) পরাজিত হয়ে গৌড় মসজিদের বড় ইমাম রুকন উদ্দীন সমরখন্দীর নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। তাঁর আসল নাম জানা যায়নি, তবে প্রচলিত নাম "ভোজর ব্রাহ্মণ"/ ভোজদেশীয় ব্রাহ্মণ। এই ধর্ম গ্রহণের প্রাক্কালে কাজী সাহেবের সঙ্গে তার নিম্নরূপ কথোপকথন হয়। যথা,-

যোগী- 'আপনাদের নবী কে'?

কাজী- 'আখেরী নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)'।

যোগী- 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের শাস্ত্রে তার নাম পেয়েছি'।

যোগী পুনরায় প্রশ্ন রাখেন- "ইনি কি সেই মুহম্মদ, যিনি সমকালীন ইহুদী পণ্ডিতদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, জীবাত্মা/ রূহ আল্লাহর একটি আদেশ মাত্র (মিন আমরে রাব্বী)"।

কাজী- 'হাঁ, তিনি তাই বলেন, আপনি ঠিকই শুনেছেন'।

যোগী- 'তিনি ছাড়া আমরা আরও দুইজন ইব্রাহীমের কথা জেনেছি। তাঁরা হলেন ইব্রাহীম ও মুসা'। এ কথা বলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

তুং যতেক দেবতাগণ সবে হআ একমন
আনন্দেত পরিল ইজার।
শূন্য পুরাণ

-রামাঞি পন্ডিত

পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে/ বচনে বলা হয়েছে -'ইন্না হাজা লা ফী সুহুফিল উলা; সুহুফে ইব্রাহীমা ওয়া মূসা'। মানে, ইব্রাহীম ও মূসার সহীফা/ সংহিতা গ্রন্থে এ কথা বলা হয়েছে/ সহীফা/ সংহিতা; ইংরেজীতে 'Code বা সংহিতা বলা হয় (তুং Code of Manu/ মনুসংহিতা) (কু। ৮৭ঃ ১৮-১৯)।

অর্থাৎ কুরআনের পূর্বতন ধর্মগ্রন্থ সমূহে এ কথার উল্লেখ আছে। কুরআনের পূর্বতন কিতাব হল যথাক্রমে- মুসা ও তার পূর্ববর্তী ইব্রাহীম প্রভৃতির কিতাবে।

মুসার কিতাব তওরাত/ তৌরাত, নামান্তর ঋকবেদ। তার পূর্বতন নবী হলেন হযরত নূহ/ হিন্দু মতে মনু ও য়িহুদী মতে নোয়া (তুং নূহের তুফান/Deluge)। ইসলামী বিশ্বাস মতে, হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীম ও হযরত মূসা (আঃ) নবী হিসেবে খ্যাতনামা ছিলেন। হিন্দু ভাষায় এঁরা হলেন অবতার, স্বয়ং ভগবানের অংশাবতার। মানে স্বয়ং ভগবান রূপে মর্ত্তে আর্বিভূত হন তারা। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ (ভগবান উবাচ) থেকে প্রমাণিত করেছেন যে, এই গ্রন্থ মূল থেকে বিচ্যুত অর্থাৎ বিকৃত হয়েছে। (শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ, ঢাকা-১৯৮৭, পৃঃ ১৫৯-৬২)। আরবী ভাষায় একে বলা হয় তাহরিফ/ বিকৃত। গীতায় 'সম্ভবাসি যুগে যুগে' অর্থে যে স্বয়ং ভগবানের আগমন বার্তা নিয়ে অবতার আগমনের কথা আছে, কুরআনের ভাষায় তা হবে যুগে যুগে নবী/ আল্লাহর বিশেষ দূত। তুং রীবন্দ্রনাথের

ভ'গবান, তুমি যুগে যুগে দূত
পাঠিয়েছ বারে বারে,
দয়াহীন এ সংসারে। ইত্যাদি

নবীবাদের এটিই যথার্থ ব্যাখ্যা

## ১। যুগে যুগে আল্লাহ্‌র দূত / নবী

শাস্ত্র মত অনুসারে যুগে যুগে মোট ১০৪ খানি গ্রন্থ/ কিতাব (দৈবী কিতাব/ অপৌরষের বাণী) মানব জাতির কাছে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে। যার মধ্যে প্রধান ৪ খানি- যথা, তৌরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন। য়িহুদী- খ্রীষ্টানগণও এই কিতাবে আস্থা রাখেন। কৌতুহলের ব্যাপার, একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তৌরাতের সঙ্গে ঋকবেদেরও বিশেষ মিল ছিল। তাহলে মোট কিতাবের নাম দাঁড়াচ্ছে-

১। তৌরাত (হিন্দু মতে ঋক/ব্রাহ্মণবেদ সহ (মুসার কালাম):

২। যবুর, (দাউদের গান / Psalms of David);

৩। ইঞ্জিল (যিশু/ হযরত ঈসার কালাম (গান); হিন্দু মতে 'যজু' ঃ ও

৪। ফুরকান বা কুরআন (মুহম্মদের গান/Mahammad's Gejang).

একমাত্র কুরআনকেই শেষ বা মুসলমানী বেদ বলা হয়েছে। এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন য়িহুদী ও খ্রীষ্টানদের 'নবী'। অবশ্য বেদ বাণী কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের জন্য নয়- সমগ্র মানবজাতির সম্পদ। হযরত মুসা প্রথম এবং হযরত মুহম্মদ (সাঃ)

শেষ কিতাবকারী পয়গম্বর। কৌতুহলের ব্যাপার, হিন্দু মতেও গ্রন্থ ৪ খানি, যেমন -ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। বিষয় যাই হোক বক্তব্য একই। চারটি বিশিষ্ট যুগে এগুলির আর্বিভাব-সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। যেমন, সনাতন/ সত্যযুগে ঋকবেদ। অবতার হলেন- মৎস্য, কুর্মো ইত্যাদি হিন্দু অবতার। সম্ভবতঃ আদি দেবতা মনু থেকে শুরু (হাম, সাম, ইয়াপেসের বংশ) সাম বেদ কোন যুগের? সনাতন দেব কে? ব্রহ্মা/ আব্রাহাম, ইব্রাহীম কি একই ব্যক্তি? ত্রেতা যুগে এলেন রামচন্দ্র (রামো, রামোশ্চ, রামোশ্চ)। অর্থাৎ রাম হলেন তিনজন)। ধরে নেওয়া যেতে পারে 'সাম' বেদের অধিকারী তিনজন রামচন্দ্র। সনাতন দেবতা হলে ব্রহ্মা (আব্রাহাম> ইব্রাহীম)। দ্বাপরে শ্রী-কৃষ্ণের গ্রন্থ কোনখানি? আমরা জানি, 'শ্রীমদ্ভাগবত' গীতাই শ্রীকৃষ্ণের গ্রন্থ। এবং গীতা অর্থাও গান। 'সাম' বেদ ও গীতা নামে বাচ্য হতে পারে। (PSalms/ hymn)। তাহলে যজুঃ বেদ কার উপরে অবতীর্ণ হয়েছিল? যজুঃ- তৃতীয় বেদ। যবুরের নামান্তর দাউদের গান। দাউদ য়িহুদী নী। কুরআন মুসলমানী বেদ, আর 'সাম বেদ' (ব্রাহ্মণ্য বেদ)। 'ঋক' ও কি তাই (ব্রহ্ম>ব্রাহ্মণ)? মুসলমানী বেদ মতে জানা যাচ্ছে- তৌরাত, যবুর ও ইঞ্জিল একত্রে বাইবেল (Old and New Testament) নামে পরিচিত। এখানেও দেখা যাচ্ছে, "ঋক, সাম, যজুঃ' মিলে 'তৌরাত, যবুর ও ইঞ্জিল' হয়েছে (বেদ-বাইবেল)। সম্ভবতঃ সাধক কবীর-দাদুর বাণীও তাই। একমাত্র শেষ গ্রন্থ-অথর্ব, যা কুরআন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। 'Psalms' কোন ভাষার শব্দ? আরবী অভিধানে একে কৃতঋণ (Borrowed word) বলা হয়েছে। ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ও একে বহিরাগত বলেছেন।

পূর্বোক্ত ভোজের ব্রাহ্মণ সম্ভবতঃ মুসলিম নবী হিসেবে এঁদেরই নাম করেছেন (ইব্রাহীম, মুসা, মুহম্মদ প্রভৃতি) হযরত মুহম্মদ (সাঃ) তাঁর শেষ নবী। হিন্দু শাস্ত্রে যিশু খ্রীষ্টের কোন স্বীকৃতি নেই। কারণ বাইবেলে যীশু খ্রীষ্টের অপঘাতে মৃত্যু হওয়ার কথা আছে। কোন অবতারের অপঘাতে মৃত্যু হওয়া বাঞ্ছিত নয়। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে, তৃতীয় বেদ/বাইবেল হযরত ঈসার ইঞ্জিল কিতাব হতে পারে। হিন্দু শাস্ত্রে যজুঃ বেদের নাম আছে। 'ইঞ্জিল' কিবাত বাইবেল (New Testament) নতুন নিয়ম)। কৌতুহলের ব্যাপার, আর কুরআনে হযরত ঈসার ক্রুসে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হওয়ার কথা অস্বীকার করা হয়েছে। এবং জানা যাচ্ছে, যীশু খ্রীষ্টের খুদার পুত্রত্বের দাবিও সত্য নয় বলে কুরআন দাবি করা হয়েছে (কুঃ ৯ঃ৩০)। যীশুর মৃত্যু রহস্যজনক। তাঁর জন্মও রহস্যজনক (কুঃ ৯ঃ ৩০)। কুরআন মতে, পূর্বতন সকল ঐশী কিতাবই কম বেশী প্রক্ষিপ্ত (আঃ তাহরিফ) হয়েছে। তন্মধ্যে পবিত্র বাইবেলের মত নিত্য পরিবর্তনশীল গ্রন্থ জগতে দ্বিতীয়

নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, দুনিয়ার পাঁচ লক্ষাধিক বাইবেল গ্রন্থে প্রক্ষেপ এত বেশি হয়েছে যে প্রাচীন বাইবেল নামে কথিত দুইখানি বাইবেলও বিশুদ্ধ বলা যায় না। বলা বাহুল্য, আল কুরআনই একমাত্র সংরক্ষিত গ্রন্থ যাতে একটি মাত্র ভুলও লক্ষ্যযোগ্য নয়।

দ্রঃ মরিস বোকাই-এর The Bible, the Coran and Science, 1983 pp. 119) আল কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণাঃ 'মানুষ জাতি এক ও অদ্বৈত এবং আল্লাহ সকলেরই এক ও অদ্বৈত স্রষ্টা ও প্রভু ব্যতীত নয় (কু। ৫ঃ৩)। তাই যদি হয়, তাহলে মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে এত বিভেদ এবং এত দলাদলি কেন? জবাব যথাস্থানে দেওয়া হয়েছে (দ্রঃ রাজা রামমোহন। তুহফাত্-উল-মুআহ্হিদীন। সাল ১২১০/১৮০৩)। এবার আখেরী নবী রসুল্লাহ (সাঃ) প্রসঙ্গে আসা যাক।

## ২। শেষ নবী প্রসঙ্গঃ

ইসলাম মতে, সর্বশেষ ঐশী কিতাবের নাম ফুরকান বা কুরআন শরীফ। হিন্দু মতে, অথর্ব শেষ বেদ। কুরআন মতে শেষ নবী মুহম্মদ (সাঃ), তাঁর পরে আর কোন নবী নেই। হিন্দু মতেও শেষ আবতার কল্কি, তাঁর পরেও আর কোন অবতার নেই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অথর্বকে 'মুসলমানী' দেব বলা হয়েছে। তুং

"যবন পবিত্র কুল বিধি বেদে বলে।
অকুলে পাইছে কুল জবনের কুলে॥
ফুলের উত্তম যেন গোলাবের ফুল।
কুলের উত্তম তেন মুসলমানী কুল॥
সকলের শাস্ত্র হৈতে জবনের শাস্ত্র ভালো।
অন্ধ নিশি মৈধ্যে যেন পূর্ণচন্দ্র আলো।।

(প্রেমরত্ন কাব্য। কবি জামাল উদ্দীন
রচনা ১২৬০ সাল/ ১৮৫৩ খ্রী)।

এখানে যবন/ জবন শব্দের অর্থ মুসলমান। যবনের কুল-মুসলমানী কুল। কল্কি পুরাণে বা হিন্দু শাস্ত্রে-যবন যোগী বলতে পরবর্তীকালে শেষনবী হযরত মুহম্মদকে বোঝানো হয়েছে। ইনিই শেষ অবতার। কল্কি পুরাণে, এমনকি প্রাচীন মহাভারতেও কল্কিকে শেষ অবতার/ কল্কি অবতার বলা হয়েছে। কল্কির পিতার নাম 'বিষ্ণুযশাঃ' মাতার নাম 'সুমতি' এবং স্ত্রীর নাম বলা হয়েছে 'রমা'।

বহুভাষাভিদ পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করলে নামগুলি যথাক্রমে -আব্দুল্লাহ, আমিনা ও বিধবা নারী/ খাদিজা নামের সমতালীয় হয়ে দাঁড়ায়। এমন কি বেদ-পুরাণে শেষ অবতার কল্কি বা মুহম্মদের নাম পাওয়া যায়- সংস্কৃত পুরাণে- মদামদ দেব, য়িহুদী কিতাবে মেওদ মেত্তদ (বিরানব্বই সংখ্যা (৯২)=মুহম্মদ), বাইবেল (নতুন নিয়মে) প্যারাক্লিট (Paraclete) গ্রীক অনুবাদে 'Paraclytos' ইত্যাদি আরবী ভাষায় মুহম্মদ ও আহমদ নামের সমতালীয়। গ্রীক ভাষায় Paraclytos অর্থ শান্তিকর্তা। পালি ভাষায় এর নাম হয় মেত্তেয়/ (সং মিত্র)। ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন, আরবী ভাষায় শেষ নবীর উপাধি হিসেবে বলা হয়েছে- 'রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন' মানে, বিশ্বের মূর্তিমান দয়া স্বরূপ (দ্রঃ শহীদুল্লাহ। নবী করীম হযরত মুহম্মদ (দঃ), ঢাকা- ১৯৮৭, পৃ ৭৭)। মেত্তেয় বুদ্ধের উল্লেখ স্বয়ং বুদ্ধদেবই ত্রিপিটক গ্রন্থে করেছেন। (পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৭)। ডক্টর শহীদুল্লাহ রেডারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এর বরাতে চীনের ধর্মগুরু কংফুচের (Confucious) একটি উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন যে, তিনি পশ্চিম গোলার্ধে যথার্থ মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্পর্কে বলতেন- 'সিফেং ইউ শিং জিন'। ইনিই শেষ নবী রসুলুল্লাহ ব্যতীত কেউ নন। কংফুচে বুদ্ধদেবের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন (পূর্বোক্ত, পৃ. ঐ। তার জন্মকাল ৫১১ খ্রী- পূর্বাব্দ।

## ৩। বেদ পুরাণে মুসলমানী প্রসঙ্গ

আগেই ভোজের ব্রাহ্মণ/যোগীর কথা বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ যোগী শেষ নবী রসুলুল্লাহর সঙ্গে প্রাচীন হিন্দু দেব হিসেবে ইব্রাহীম ও হযরত মুসার স্বীকৃতি দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, হযরত মুসা য়িহুদী জাতির (হিব্রু) সর্ব প্রধান নবী। তাঁর উপরেই প্রথম পূর্ণাঙ্গ ঐশী কিতাব সহীফা/ সংহিতা নাজিল হয় (খ্রীঃ পূ ১৫০০ অব্দের দিকে) আর হযরত ইব্রাহীমকে 'তৌরাত'-এ ABRAHAM? Father of Nations বলা হয়েছে। আল কুরআনেও 'আবীকুম ইব্রাহীম'/ জাতির পিতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ভারতীয় হিন্দুদের মতেও পিতামহ ব্রহ্মা/ সনাতন দেব (ABRAHAM/ ইব্রাহীম) বলা হয়েছে। এবং বলা বাহুল্য, কুরআন-বাইবেলে ইব্রাহীমের উত্তরাধিকারী হযরত মুসা ও তাঁর সূত্রধারী নবী হযরত মুহম্মদের কথা বলা হয়েছে। আল কুরআনে তাঁর সমর্থনে বলা হয়েছে- "এ গ্রন্থ (কুরআন) মুসার গ্রন্থের সমর্থক আরবী ভাষায়। এ সীমা লংঘনকারীদের জন্য সতর্ককারী এবং তাদের সুসংবাদ দাতা (কুঃ ৪৬ঃ১২)। এই সঙ্গে আরও বলা হয়েছে, "আমি (আল্লাহ) যদি আজমী ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় কুরআন নাজিল করতাম, ওরা অবশ্যই বলত, 'এই আয়াতগুলি বোধগম্য ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চার্য,

এর ভাষা আজমী (অনারব ভাষা) অথচ রসুল আরবীয়। বল, বিশ্বাসীদের জন্য এ পথ নির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার স্বরূপ (কুঃ ৪১ঃ৪৪)। উল্লেখ্য 'আল্লাহ' শব্দটি হিব্রু বাইবেলেও ছিল। পরবর্তীকালে গ্রীক বাইবেলে শব্দটি বর্জিত হয়েছে। দ্রঃ The Choice. p. 22)। তুং এলি, এলা/ আলাহ-আল্লাহ। উল্লেখ্য, এখানে মাতৃভাষার প্রাচীনতম অর্থাৎ অনারব/ আজমী ভাষায় এবং আরবী আরবের মাতৃভাষা আরবীতে নাযিল হয়েছে। আজমী অর্থ আরব বহির্ভূত এলাকায় মাতৃভাষায় (হিব্রু, ইব্রানী/ ইব্রাহীমী) এবং কুরআন আরবী ভাষায় নাজিল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। (অবতারণ কাল ৬১০-৬৩২ খ্রীঃ)। এক আদমের সন্তান সবাই। শুধু তাই নয়, কুরআনে আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে "(আল্লাহ বলেছেন)- আমি আমার প্রত্যেক নবীকেই তাদের মাতৃভাষায় আমার ধর্ম (দ্বিন) প্রচার করতে এ কারণে পাঠিয়েছি যেন, তারা সুস্পষ্ট ভাষায় আমার ধর্ম প্রচার করতে পারে (কুরআন)"। বিশ্বলিপির উদ্ভাবকও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। কুরআনে আরও বলা হয়েছে, দুনিযায় এমন কোন (স্থান বা) জাতি নেই, যাদের কাছে আমি হেদায়েতকারী (নবী) পাঠাইনি। যেমন লেকুল্লে কাওমিন হাদ (কু। রাদ। ১৩ঃ৭)" 'হাদ' অর্থ- নবী/ পয়গম্বর। হিন্দু ভাষায় 'দূত' বলা যেতে পারে। উল্লেখ্য হযরত ইব্রাহীমের জন্মভূমি ইরাকে, বিচরণ স্থান- সসাগরা ধরিত্রি জুড়ে (Greater India/ ভূ-ভারত)।

## ৪। যব দ্বীপীয় মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বনাম হযরত মূসা

সম্প্রতি যবদ্বীপীয় সংস্কৃত মহাভারত থেকে মহাভারতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির সংক্রান্ত এক কৌতুহলজনক কাহিনী আবিষ্কৃত হয়েছে। যা কিনা কুরআন-বাইবেলে হযরত মূসা ও হারুন (আঃ) কাহিনীর আশ্চর্য সাযুজ্য রাখে (যবদ্বীপ- বর্তমানে ইন্দোনেসিয়া)। বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ-সখা অর্জুন-যুধিষ্ঠিরকে (ভগবান) শ্রীকৃষ্ণ যে দুটি মহা অস্ত্র ('তুংগুল নাগ' ও 'কলমা সাদা') উপহার দিয়েছিলেন, যবদ্বীপে মুসলিম অধিকারকালে জনৈক সুলতান 'কালী জাগা (Kalidgaga) দরবেশে তা হরণ করে যবদ্বীপে ইসলামী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ফলে দৈব অস্ত্র হারিয়ে যুধিষ্ঠিরকে অগ্নিতে প্রবেশ করে পরলোকগমণ করতে হয়। কিন্তু মৃত্যুকালে যুধিষ্ঠির তাঁর অনুসারীদের এই নিশ্চয়তা দান করেন যে, মুসলিম যোগীর হাতে, হিন্দু ধর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হলেও ভবিষ্যতে তাঁর ঐন্দ্রজালিক হাজি বিদ্যার প্রভাবে যবদ্বীপ হিন্দু আধ্যাত্মিকতাই চিরস্থায়ী হবে। অর্থাৎ যবদ্বীপে মুসলিম আধিপত্য কোনদিনই কায়েম হতে পারবেনা। (তুং প্রেমরত্নকাব্য। জামাল উদ্দীন)। কৌতুহলের ব্যাপার, মুসলিম দরবেশের নাম 'সুলতান কালী জাগা',

মানে, 'কালী-সিদ্ধা' হতে পারেনা। বলা বাহুল্য, যোগ শাস্ত্র কোন বিশেষ ধর্ম/ সম্প্রদায়ের নয়)। শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত দৈব অস্ত্রের নাম 'তুংগুল নাগ' / Toeagguel Naga এবং কবচটির নাম 'কল্‌মা সাদা'। শব্দ দুটি যবদ্বীপীয় ভাষায় (বর্তমান ইন্দোনেসিয়া)। এর অর্থ আমাদের জানা নেই। তবে কাহিনীটি অবিকল হযরত মুসার বিখ্যাত 'আসা'/যষ্ঠী ও 'কালিমা-ই-শাহাদৎ' অর্থের সমতালীয়। নাগ যষ্ঠী থেকে মুসার 'আসা'র অনুরূপ নাগ বা সর্প বিনির্গত হত এবং কল্‌মা সাদা ছিল একটি ঐন্দ্রজালিক কবচ বা তাবিজ। আর ভগবান শব্দটি সম্মানার্থে বলা যেতে পারে (তুং ফা হযরত, জনাব)। তুং 'শিব শক্তি ভগবান' এ কালে বড় পরিচিত হয়ে পড়েছে (দ্রঃ মুসলমানী নাম ইসলামুল হক)। 'কলমা' শব্দটি সম্ভবতঃ আরবী 'কালিমা' /'কলেমা' শব্দজাত। অর্থ আল্লাহ প্রদত্ত বাণী/ ওহী লিখিত কবচ। যার মূল মন্ত্র হল -'লা ইল্লাহা ইল্লাল্লাহু, মুসা কালিমুল্লাহ'। মানে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুসা তাঁর প্রিয় নবী মাত্র। সুলতান কালীজাগা দরবেশের কৌশলে এই মন্ত্রঃপুত দ্রব্য দুটি হস্তগত হওয়ায় যুধিষ্ঠিরের পতন হয় ও ইন্দোনেসিয়ায় মুসলিম আধিপত্য (মুসার নবুয়ত) কায়েম হয়। এটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। বহু ভাষাবিদ ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, কাহিনীটি একটি 'সজ্ঞান রূপক'। অর্থ, দরবেশ সুলতান কালী-সাধনার মাধ্যমে এই অস্ত্র লাভ করেন বলে তাঁর নাম 'কালী-জাগা' দরবেশ হয়। মা কালী পৌত্তলিক বিশ্বাসের দেবী (মহামায়া)। কিন্তু একজন ইসলাম-বিশ্বাসী (মুসলিম) কিভাবে এই পৌত্তলিক কালী-সাধনার ব্যাখ্যা করবেন? কালী দেবী এখানে 'কালিমাহ' শব্দের সমার্থক (কলেমা) মনে হয়। পক্ষান্তরে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে দেখা যায়, আরবী (হিব্রু-) কালিমাহ/ কলেমা বা বাক্য/বাণী থেকে ব্যুৎপন্ন। হিন্দু দেবী 'কালীমা' নিতান্তই কাল্পনিক দেবী মাত্র। মুসলিম বিশ্বাসের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না। মূলতঃ মা কালী-কালিকা বাণী/ স্বরস্বতী বাক্য মাত্র, দেবী নয়।

তুং লালনের বাণী- "যতসব কলমা কালাম লেখা আছে কোরান মাঝে। তবে কেন পড়া ফাজেল গুরু ভজে।" সুধী সমাজের অবগতির জন্য এখানে একটু খুলাসা করার চেষ্টা করা যাচ্ছে। বলা হয়েছে, 'কালী-সাধক' দরবেশ নাম কোন মুসলমানের হতে পারে না। কারণ তৌহীদ/ নিরাকার একেশ্বরবাদী মুসলমান কিভাবে পৌত্তলিক কালী- সাধনায় অংশীদার হতে পারে? আর তা ছাড়া 'কালিমাহ' শব্দটি আরবী অর্থ-বাণী/বাক্য, তার কোন মূর্তি বা প্রতিমা হতে পারে না (তুং হিন্দু শাস্ত্র-বাণীও এক মেবাদ্বিতীয়ং) ভগবান এক ও অদ্বৈত। সকল শাস্ত্রের কথাও তাই।

## ৫। ইসলামে কালিমা-কালাম প্রসঙ্গ

ইসলামে 'কলেমাহ' ই-তৌহীদ, নিরাকার স্বাক্ষ্য বাক্য। কিন্তু পৌত্তলিক ভারতবর্ষে নিরাকার বাণী বাংলা কালিমা মূর্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। শুধু তাই নয়- স্রষ্টা মাতৃ-পিতৃ মূর্তি রূপে (বাক-প্রতিমা) পূজা পেয়েছে। বলা বাহুল্য, আদিতে সকল ধর্মই নিরাকার এবং অদ্বৈত বাণী রূপে স্বীকৃত ছিল। মূর্তি পূজা পরবর্তী সংযোজন (তুং তন্ত্র, শাস্ত্রের উক্তি 'কলৌকালী, কলৌকৃষ্ণ, কলৌ গোপাল কালিকা"। অর্থাৎ কালী, গোপাল সবই একার্থক স্রষ্টা 'আল্লাহ' ব্যতীত নয়। অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব রাম সকল আমার এলো কেশী, (শাক্ত করি)। আল কুরআনে হযরত মুসার ইসমে আযম 'আল্লাহ' এই নাম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-মানে, নেই কোনো উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, এই বাণীই হয়েছে মহাভারতের পূর্বোক্ত 'কলমা'/কলিমাহ মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে পৌত্তলিক শক্তি কবচ (হাজিবিদ্যা) রূপে দেখা দিয়েছে বলা যেতে পারে। মুসলিম মতে কারিমাই আল্লাহর বাক্য মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির কাহিনী তারই রূপক কাহিনী বলা যায়। তুং মরমী কবি লালন শাহের প্রশ্ন

"কি কালাম পাঠাইলেন আমার সাঁই দয়াময়।
এক এক দেশে এক এক বাণী কোন খোদা পাঠায়।"

এই প্রশ্ন ব্রাহ্ম ধর্ম প্রবক্তা রাজা রামমোহন রায়েরও ছিল (দ্রঃ তুহফা। রামমোহন রচনাবলীকাল-১২, ১৯৭৩ পৃ. ৭২৯)। কালাম এখানে ওহী/ (আঃ/বাণী অর্থে। আল্লাহর যেমন কোন আকার/ আকৃতি নেই, আল্লাহর বাণীরও তেমনি কোন রূপ ও রেখা নেই। এটি তৌহীদ/ একেশ্বরবাদী ধর্মের মর্ম কথা। ইসলামে কোন শিশুতোষ কল্পনারও কোন স্থান নেই (হিন্দু শাস্ত্রে 'অপরা' ও 'পরাপূজা', মানে, সাকার ও নিরাকার পূজার কথা আছে। সাকারস্বরূপ ও নিরাকার অরূপ পুজা)। (দ্রঃ বিনোবা (ভাবে)। গীতাপ্রবচন। ৩য় সং, ১৯৫৬ খ্রী, পৃ. ১৪৫)। যেমন, বিনোবা বলেন, "হিন্দু, খ্রীষ্টান, ইসলাম আদি সকল ধর্মে কোন না কোন আকারে মূর্তিপূজা প্রচলিত আছে। মুর্তিপূজা নিম্নস্তরের বলিয়া পরিগণিত। তবু তাহা মান্য হইয়া গিয়াছে। আর তাহা মহানও বটে। মাতৃপূজা যতক্ষণ নির্গুণের সীমায় থাকে ততক্ষণ তাহা নির্দোষ। এই সীমা লঙ্ঘলন করিলেই সগুণ দোষ হইয়া যায়।" এ থেকেই 'শিব-উমা'/ প্রকৃতি পূজার উদ্ভব হয়েছে এ দেশে। উল্লেখ্য, বাইবেলে ত্রীশ্বর বাদেরও কোন অস্তিত্ব ছিল না। পরবর্তী পাদরী সেন্টপলের প্রভাবে এই ত্রিত্ত্ববাদের জন্ম হয়েছে। অবশ্য পরবর্তী কালে একত্ববাদী খ্রীষ্টান মতের জন্ম হয়েছে। উল্লেখ্য, আল্ কুরআনে মোট আটজন নবী/ অবতার কর্তৃক এই বিশেষ 'কালাম' প্রচারের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যথা-

হযরত আদম, হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসমাঈল, হযরত মূসা, হযরত দাউদ, হযরত ঈসা ও হযরত মুহম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তাদের সকলের 'কালিমাহ' এক ছিল। সকল ঐশী কিতাবসমূহে তাঁদেরই নাম প্রচারিত হয়েছিল বলে কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। বিভ্রান্তি এসেছে পরে (কু। ৪৩ঃ২১-২২)। হিন্দু শাস্ত্রে উল্লিখিত অবতারগণকে মানব জাতির পথ প্রদর্শক নবী/ পয়গম্বর বলে মনে নিলে আর কোনো বিপত্তি থাকে না। পূর্বোক্ত কবি জামাল উদ্দীনের প্রেমরত্ন কাব্যের (১২৬০/১৮৫৩ খ্রীঃ) শ্রীকৃষ্ণ- যুধিষ্ঠির সংক্রান্ত াহিনীতেও যবদ্বীপীয় মহাভারত কাহিনীতেও 'কালি জাগা' দরবেশের কাহিনীর াযুজ্য মেলে।" কাব্যখানি উত্তর বঙ্গে রঙ্গপুর দিনাজপুর এলাকায় শতবর্ষ পূর্বেও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এটি সমকালীন কলকাতা থেকে একাধিক বার ছাপা হয়েছিল।

প্রেমরত্ন কাব্যে- 'যবন-যোগী' নামও তার সমতালীয়। তাই মনে হয়, যবন াগীর নিকট পরাজিত ও পর্যুদস্ত শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান কালে এই বলে বিদায় গ্রহণ রেন। যথাঃ-

"কৃষ্ণ বলে সখা তরে দোষ দিতে নারি,
শব্দ প্রতি বাণ চালে আমি শব্দ করি।
কলেমা আজান রব করিয়াছি আমি
হিন্দু কূল তেয়াগিয়া যবন কূলে গামী।
জপিনু অজপা নাম বাণ হৈল ক্ষয়
যাইব জবন কূলে জবনের জয়॥"

এখানে শ্রীকৃষ্ণকে নবী মাত্র বলা হয়েছে। 'অজপা' নাম অর্থ যে নাম বাহ্য অর্থে াপনীয়, যে নাম জপলে সাধনায় সিদ্ধি হয় ইত্যাদি। তারপরে কি হল-?

"কোথা গেল শ্যামচন্দ্র বিধি জানে তারে
গিয়েছে জবন শাস্ত্র অনুসারে।
তদন্তরে শ্রীরাধিকা হয়েছে জবনী।
সে ভিন্ন কথা।"

এ সব অধ্যাত্ম অর্থ, এক কথায় হেঁয়ালি বলা যেতে পারে। তুং ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম'/ ইসলামই একমাত্র মানব ধর্ম। (কু। পূর্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-কালী জাগা (যবন ধর্ম) ইত্যাদি সব কিছুই একটি হেঁয়ালি ব্যতীয় নয় (তুং আলংকারিক প্রয়োগ। রূপক (আ-মুতাশাবিহ আয়াত)।

## ৬। সৈয়দ সুলতান ও নবী বংশ প্রসঙ্গ

খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের মরমী কবি সৈয়দ সুলতান তার নবী বংশে পর্যন্ত এমনি একটি মরমী পরিবেশ প্রবাহিত। সৈয়দ সুলতান তাঁর এই মরমী কাব্যে যথার্থই বলেছেন ঃ

"বোলে হরি আহ্মারে সৃজিলা করতার।
পাক কর্ম্ম নিষেধ সে করিতে যে কারণ।
মোর বাক্যে না ধরন্ত দুষ্ট নরগণ
মুরতি গঠিয়া সবে পুজে অনুক্ষণ।
মোকে পরামাত্মা বুলি ভাবে সর্বজন
পরমাত্মা নহি আমি হই এ বিনাশ।

★ ★ ★

সমুদ্রের কূল হই না হই সাগর
সূর্য্যের কিরণ হই নহি দিবাকর।

এখানে শ্রীহরি-অর্জুনের উল্লেখ নিঃসন্দেহে ভারত পুরাণের কথা। বলা বাহুল্য, নবীবংশ আরবী/ইসলামী নবী-কাহিনী (কাসাসুল আম্বীয়া) ব্যতীত নয়। হরিবংশও তাই। এখানে সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, মহাভারতীয় শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন ও আলোচ্য নবীবংশ কাহিনীর সমমূত্রে গ্রথিত (তুং নবী মূসা ও হারুন)। আরও কৌতূহলের ব্যাপার, সংস্কৃত মহাভারত ও বাইবেল কুরআন কাহিনীতেও এর ব্যতিক্রম ছিল মনে হয় না। সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ তারই উত্তরাধিকারী।

তুলনীয়- মহাভারতীয় শ্রীকৃষ্ণ-কংস নারায়ণ ও বাইবেল কুরআনের মুসা-ফিরাউন বিষয়ক কাহিনী (এতে মুসার 'আসা' ও 'কালিমাহ' এর কথাও বলা হয়েছে, এছাড়া শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোরের কাহিনীর সঙ্গে মুসার বাল্য-কৈশোর ও যৌবনের অত্যাচারী ফিরআউন-কংস নারায়ণ কাহিনীরও স্মরণ করিয়ে দেয়। পার্থক্যের মধ্যে অবশ্য মুসার নির্যাতিত স্বজাতিকে উদ্ধার পূর্বক নীলনদ পাড়ি দেওয়ার কাহিনীকে ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। কিন্তু সাম্প্রতিকালে বাঙালী কবি মধুসূদনের মেঘনাদ বধের রামচন্দ্র কর্তৃক সাগর বন্ধন পূর্বক সীতা-উদ্ধার কাহিনীর সঙ্গে মধুসূদনের একটি উপমা-প্রয়োগের একটি চমৎকার নির্দশনের উল্লেখ করা যেতে পারে। যথাঃ-

"হায়লো সজনী
দিনে দিনে হীনবীর্য রাবন দুর্মতি,
যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে।"

আপাত দৃষ্টিতে উপমাটিকে উদ্ভট, এমন কি অবান্তরও মনে করা যেতে পারে। কিন্তু একটু সুক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এখানে "যাদঃপিত রোধেঃযথা," কথাগুলি কুরআনিক হযরত মুসার আসা/ষষ্ঠীর আঘাতে নীলনদের স্রোতধারা যেমন করে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তেমনি করে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে, 'যদুপতির' বদলে 'যাদঃপতি' বলা হয়েছে। হযরত মুসাই ছিলেন 'যুদাহ্পতি' এবং শ্রীকৃষ্ণ হলেন 'যদুপতি'। এখানে শুধু নাম সাদৃশ্য নয় 'তুংগুল নাগের' অধিকারী শ্রীকৃষ্ণ ও আসা/ষষ্ঠীর অধিকারী মুসা ছিলেন 'যুদাহপতি'। এটি ঐতিহাসিক স্বীকৃতি। হযরত মুসার ষষ্ঠী প্রহারে যেমন নীলনদ/ সাগরের গতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, এখানেও শ্রীরামের কৌশলে সাগর বন্ধনও সম্ভব হয়েছিল। কি আশ্চার্য সাদৃশ্য। এখানে শ্রীকৃষ্ণ ও মুসার কাহিনীর সাদৃশ্যও বিস্ময়কর। এখানে আরও উল্লেখ, কাহিনীটি মিলেছে ইন্দোনেসিয়ায়-বর্তমান যবদ্বীপে (জাভা প্রদেশে)।

## ৭। বাইবেল-কুরআনে বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ

এবার বাইবেল কুরআনে বর্ণিত বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গে আসা যাক। কুরআন বাইবেল সূত্রে জানা যায়, হযরত ইব্রাহীমের পুত্রদ্বয় হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইসহাকের বংশধারা থেকে মানব জাতির প্রকৃত ঐতিহাসিক ধারা সূত্রপাত হয়। ইসহাকের পুত্র ইয়াকুব/ জ্যাকব, তার পুত্র ইয়াহুদা/ যুদা। (তুং গ্রীক দেবতা যিউস /Jews)। পবিত্র কুরআনের দাবিও তাই (কুরআন। ৪ঃ২৬)। শেষ নবীর কিতাবে কোন বানানো কথা নেই (কু। ১২ঃ৫৯/১১১)। বাইবেল-কুরআন সূত্রে জানা যায়, আল্লাহর নির্দেশে জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈলের কুরবানী/ উৎসর্গ দানের পর পার্থিব বিষয়-সম্পত্তির প্রতি অনাসক্তির জন্যই হোক আর পার্থিব উত্তরাধিকারিত্বের কারণেই হোক, কনিষ্ঠ পুত্র (প্রাধান্য পত্নীর (বিবি সারার) পুত্র হযরত ইসহাকের বংশ নবুয়তের উত্তরাধিকারী হন। ফলে হযরত ইসহাকের পুত্র হযরত ইয়াকুব/ নামান্তর ইসরাঈল, হযরত ইউসুফ হযরত মুসা প্রভৃতি ইসরাঈল বংশের সর্বশেষ নবী হযরত ঈসার পরে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) শেষ নবীর মর্যাদা লাভ করেন। বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের ইসরাইল-ফিলিস্তিন রাষ্ট্র তার উত্তরাধিকার বহন করছে। সম্ভবতঃ মধ্যপ্রাচ্যেই মূল ভারত ভূমির কেন্দ্রবিন্দু ছিল (Human destributing centre)। অবশ্য শেষ নবী হযরত ইসহাক- ইয়াকুবের সাক্ষাৎ বংশধর না হলেও হযরত ইব্রাহীমের জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈলের বংশের এবং ইব্রাহীমের আর্শিবাদপুষ্ট শেষ নবী রসুলুল্লাহ জগতের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতিশ্রুত নবী হিসেবে প্রেরিত। যিশু ছিলেন ইসমাঈল বংশের শেষ নবী। আগেই বলা হয়েছে, হিন্দু মতেও সর্বশেষ অবতার কল্কি (হযরত মুহম্মদ

নবীবংশের শেষ নবী)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভোজদেশীয় যোগী ভারতবর্ষীয় তিনজন নবী/ অবতাদের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন- তাঁরা যথাক্রমে হযরত ইব্রাহীম, হযরত মুসা এবং শেষ নবী রসুলুল্লাহ (সাঃ)। তাই শাস্ত্রীয় সূত্রে প্রাপ্ত একে ঐতিহাসিক কাহিনী বলতে পারা যায়। পুরাণ কাহিনীতে যে তিনজন রাম অবতারের কথা বলা হয়েছে, সম্ভতবঃ এঁরা তাঁরাই। যেমন, 'রামো, রামশ্চ, রামশ্চ'। সম্ভবতঃ এঁদের প্রথম রাম হলেন পরশুরাম/ভৃগুরাম (ভৃগু/মহাদেবের আর্শীবাদপুষ্ট 'ভার্গব')। ভৃগুরামের নামান্তর পরশুরাম বা কুড়ালধারী রাম। ইনি দৈব অনুগ্রহ প্রাপ্ত পরশু বা কুড়াল অস্ত্রের সাহায্যে পরবর্তীকালে অন্যায় ভাবে ক্ষত্রীয় নিধনে ব্যাপৃত হলে তার বিরুদ্ধে সপ্তম অবতার (রঘুবংশীয় অবতার) রামচন্দ্র কর্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হন। পুরাণ মতে, ভৃগুরাম ছিলেন মহাদেবের ষষ্ঠ অবতার। সপ্তম অবতার হলেন রঘুরাম বা আর্যপুত্র রামচন্দ্র। তার কাহিনী বাল্মিকীকৃত রামায়ণ কাহিনীতে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ইনি দশোরথপুত্র শ্রীরাম (রঘুপতি 'রাঘব')। তৃতীয় রাম হলেন সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণ-যদুপতি যাদব। বাইবেলে ইনি যুদাহপতি হযরত মুসা। ভারতীয় শূদ্র জাতির ত্রাণকর্তা। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ী বীরের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। হিন্দু মহাভারতের ইনিই প্রধান রূপকার। বাংলা কাব্যে নবীন চন্দ্রের ত্রয়ীতে (রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে) শ্রীকৃষ্ণ পরিকল্পিত মহাভারতের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

এখানে বিস্তারিত আলোচনার স্থানাভাব। বাইবেল-কুরআনে রঘুপতি রাঘবের কোনো উল্লেখ না থাকলেও কুরআনে বর্ণিত 'সর্বোত্তম মানবীয় কাহিনী'/ আহসানুল কাসাস নামে কথিত হযরত ইউসুফ কাহিনীর সংগে তার বিশেষ সাযুজ্য আছে। হযরত ইউসুফ হযরত ইয়াকুবের সুদর্শন এবং প্রিয় পুত্র। কৌশল্য-নন্দন রামচন্দ্রও তাই। ইনি স্বয়ং ভগবান বলে কথিত হলেও বাল্মিকী তাঁকে 'নরোত্তম' রাম বলেছেন। রামচন্দ্রের মত রাজ্যভিষেকের শুভক্ষণেই (নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বক্ষণে) ইনি (বিমাতা কৈকেয়ী ও বিমাতা ভ্রাতৃদের মত) সংসার থেকে বিতাড়িত ও অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হন এবং পরে দাসরূপে বিক্রিত হন। দৈবক্রমে সুদূর মিশর দেশে রাজপদে বৃত রাজ্য স্থাপন ও রাজ্য শাসনে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন (তুং রাম রাজ্য)। কৌতুহলের ব্যাপার, রামচন্দ্রের মত স্বপ্নে রাজপদ (নবুয়ত) লাভের কাহিনী শুনে বৈমাত্রের পুত্রগণের দ্বারা নির্যাতিত ও বিড়ম্বিত হয়ে ইউসুফ প্রথমে অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হন, পরে সুদূর মিশরে দাসরূপে বিক্রিত হন। আরবীতে 'রামা' শব্দের অর্থও নিক্ষিপ্ত হওয়া। শুধু তাই নয়, যে জনপদে ইউসুফ রাজ্যাভিষিক্ত হন। কৌতুহলের ব্যাপার, সে রাজ্যের রাজধানীর নামও ছিল 'রামোশ' এমনকি রাজার নামও রামাসিস-৩/ রাম। বাইবেলে 'রাম' নামে নবীর কথা আছে। রামচন্দ্রের প্রিয়

লক্ষ্মণ ভাইয়ের মত ইউসুফও বানী আমিন ভাইকে সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলেন। বাংলা ইউসুফ জোলায়খা কাব্যেও কবি শাহ মোহম্মদ সগীর বনী আমিন ভাইয়ের প্রসঙ্গ তুলেছেন। উল্লেখ্য, বনী আমীন সুবর্ণ পুরীর জনৈক গন্ধর্ব রাজকন্যা বিবাহ করেন। ইনি ছিলেন মহেষ দেবতার পুজারী (তুং মহেশ্বর/শিব)। বিস্তারিত আলোচনার স্থান এ নয়। বাইবেল থেকে আরও জানা যায়, ইউসুফের ওফাতকালের অসিয়াত অনুসারে তাঁর মৃতদেহ পিতৃভূমি কানানের পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করা হয়। ফারসী কবি হাফিয তাঁর শানে এক চমৎকার কবিতায় তাঁকে অমর করে রেখেছেন। কবি নজরুল ইসলাম তার একটি সুন্দর অনুবাদ করেছেন। যাতে আছে-

"দুঃখ কি ভাই হারানো ইউছোপ
আবার কানানে আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এই মরুভূমি পুনঃ
হয়ে গুলিস্তা হাসিবে ধীরে।"

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, শুধু ইউসুফ নয়, আদি পিতা হযরত ইবাহীম (আঃ) থেকে হযরত ইউসুফ পর্যন্ত সকল নবীই বর্তমান ফিলিস্তিনের হেবরস্থ আল জলীল নামক গোরস্তানে সমাহিত আছেন। কবরস্থানের বাসিন্দাগণ হলেন-যথাক্রমে হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত ইউসুফ প্রভৃতি। হযরত মুসা, দাউদ, হযরত ঈসা নবীও এই এলাকার ছিলেন। আরও উল্লেখ্য হযরত ইয়াকুবের জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াহুদা বা জুদাহ (হি.) থেকে 'ডুডিয়া' নামের উৎপত্তি হয়। হিন্দু ভারতে 'যদুবংশ' নাম এই যুদাহ থেকেই গৃহীত হয়েছে। বিখ্যাত নবী হযরত মুসা এই যুদাহ বংশেরই সুসন্তান ছিলেন।

বাইবেলের 'The Ten Commandments' অধ্যায়ে যুদাহ্পতি মুসার মিসর অভিযান ও তদীয় নির্যাতিত (হিব্রু/ Hebru) জাতির উদ্ধার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এই অভিযান কালে হযরত মুসা নিজেকে 'হিব্রু দি স্লেভ' বলেছেন। উল্লেখ্য মধ্যপ্রাচ্যের এই সেদিনও ঈসরাঈলীয়গণ ঘৃণ্য দাসরূপে বিবেচিত হত। আধুনিক হিন্দুভারতে শূদ্রদের অবস্থা কি তার চেয়ে অধিক উন্নত আছে? মনুসংহিতায় শূদ্রদের অধিকারহীনতার বিষয় যে বিবৃতি আছে, আধুনিক দুনিয়ার যে কোন মানুষের জন্য তা লজ্জার কারণ। শাস্ত্র বাক্য শ্রবণ করলে শ্রোতার কানে তপ্ত শীসা গলিয়ে ঢেলে দেওয়ার কথা তো দূরের কথা, কুরআন থেকে জানা যায়, মনুর ব্যবস্থায় জাতিভেদই অনুপস্থিত ছিল। ইসলামে মানবতা বিরোধী কোন ব্যবস্থাই স্বীকৃত হতে পারে না। তুং মুসলিম কবির ভাষায়-

"জাতির বড়াই তুড়িতে
দীনের রসুল দয়াময়
বারংবার চেষ্টা করে যাব।
সেই জাতির গৌরব কবে
বাংলাদেশের সৈয়দ মরে
এ কথা বলিব কারে
দুঃখে মরি সদায়।।"

-দুদ্দু শাহ।

বলা বাহুল্য, মনুও (খ্রীষ্টান মতে নোয়া) ইসলামানুগত নবী/ ভাববাদী ছিলেন। পরবর্তী বৌদ্ধ ধর্মেও ইসলামী ব্যবস্থা চালু ছিল। বৌদ্ধ ধর্মকে শূন্যবাদী ধর্ম বলা হলেও আসলে বুদ্ধের ধর্ম ছিল নিরাকার একেশ্বরবাদী (নিরঞ্জন সং নারায়ণ)।

## ৮। জলমগ্ন দ্বারকা ও শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ।

সম্প্রতি ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত গুজরাটের নিকটবর্তী আরব-সাগর গর্ভে প্রাচীন দ্বারকা (জলমগ্ন) নগরীর সন্ধান মিলেছে। এখানেই হিন্দু ভারতের অবতার শ্রীকৃষ্ণ রাজত্ব করতেন। (দ্রঃ ডঃ এস.আর. আও) জলমগ্ন দ্বারকা নগরী, সচিত্র ভারত, মার্চ, ১৯৮৮)। হাদিস শরীফে কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট একজন ভারতীয় নবীর বিষয়ও অবগত হওয়া যায় তার নাম 'কাহেন' (<কৃষ্ণ>কাহ্ন)। (হারিস দোলমী, তারিখে হামদান বাবুল কাফ/ সত্যের রূপ/ পৃ. ২৫-২৬)।

আফসোসের বিষয় আমরা কথায় কথায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুসরণে বাইবেল-কুরআনের সাযুজ্য টেনে বিশ্বে মানব জাতির আবির্ভাব বিষয়ে নানা কষ্টে কল্পনা করি ও মানব জাতির আবির্ভাবের সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে পৌছবার চেষ্টা করি। অথচ পার্শ্ববর্তী বিরাট হিন্দু বা মুসলমান জাতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের কথা ভুলে যাই। অথচ আমরা জানি, দুনিয়া জোড়া মানব জাতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত আদি মাতা পিতার (আদম-হাওয়া বা শিব-উমা) কোলচ্যুত অসহায় মানুষের মত কেবলই পরস্পর -বিরোধী কল্পনার বিভীষিকার স্বীকার হচ্ছে। পরস্পর সম্মিলিত হওয়ার কি কোন পথই নেই? বাংলার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাই বলতে ইচ্ছে হয়-

"কেন এই ব্যবধান? কেন উর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে
রুদ্ধ মনোরথ? কেন প্রেম আপনার
নাহি পায় পথ?"

(মেঘদূত। -রবীন্দ্রনাথ)

আজ জ্ঞান বিজ্ঞানের নয়া নয়া প্রযুক্তির পথে আমাদের অভিযাত্রা অথচ মানুষ আদিমকালের মতই অসহায় ও দিশেহারা? অথচ আমাদের সকল ধর্ম সংস্কৃতির একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে সকলেই বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে অরণ্যে রোদন (Crying in the Wilderness) করে ফিরছে। কাশ্মীর-ভারতে, ইসরাঈল-ফিলিস্তিনে, বসনীয়া- হার্জেগোভিনায় তারই মর্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাচ্ছি। হায়রে কবে আর মানুষ মানুষ হবে?

পবিত্র কুরআন তো বলেই চলেছে-"এবং তারা বলে যে তোমরা য়িহুদী হও, অথবা খ্রীষ্টান হও, তবেই মুক্তি পাবে। তুমি বল, (হে মুহম্মদ) বরং আমরা ইব্রাহীমের সুদৃঢ় পথেই আছি এবং তিনি (পৌত্তলিক) অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তোমরা বল আমরা আল্লাহর প্রতি, এবং আমাদের নিকট যা প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে, এবং যা মুসা বা ঈসাকে যা দেওয়া হয়েছে, এবং অন্যান্য নবীগণকে যা প্রদত্ত হয়েছিল, তৎসকলের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করছি। তাদের মধ্যে কাউকে আমরা প্রভেদ করছিনে, এবং আমরা তাঁরই প্রতি সমর্থনকারী (কু। ২ঃ১৩,ঃ ৪-১৩৬)।" এখানে হযরত ইব্রাহীমের রক্তের ধারা নয় শুধু আদর্শিক ধারার কথাও বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, মুহম্মদ যেন ভুলে না যান যে, তিনি হযরত ইব্রাহীমের উত্তরাধিকারী। তিনি যেন য়িহুদী খ্রীষ্টানদের মত পথচ্যুত না হন, এবং তার মূল পথ অনুসরণ করতে ভুলে না যান। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআন ইতিপূর্বেও হযরত নূহ সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, হযরত নূহের পুত্র কেনান তাঁর পুত্র হলেও নবুয়তের কথা অস্বীকার করায় আল্লাহ তার প্রতি বেজার হয়ে তাকে মহাপ্লাবনে ধ্বংস সাধন করতেও ইতস্ততঃ করেননি। এমনকি প্রিয় বন্ধু হযরত নূহের অনুরোধও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। বাইবেলে হযরত নূহ হলেন 'নোয়া' এবং হিন্দু শাস্ত্রে 'মনু' (দ্রঃ মনু সংহিতা)। য়িহুদী-খ্রীষ্টানগণ সম্পর্কেও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। (মনু>মানব)। হযরত নূহ তারই উত্তরাধিকারী (কেনানের পিতা)। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন দ্বীন-ই-হানীফ অর্থাৎ সত্যসন্ধ মুসলমান (সংস্কৃত 'ব্রাহ্মণ' শব্দের অর্থ দ্যোতনাও তাই)। ভারতীয় হিন্দুদের আদি পিতা ব্রহ্মা পুত্র- হামশাম ইয়াপেসের বংশেই আবির্ভূত হন। বর্তমান ভারতীয় ফৈজাবাদে তথাকথিত রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কেও ওই একই কথা বলা যায়। রাম-রহীম যদি জুদা না হয়, তাহলে মুসলমানের মসজিদ ভেঙ্গে মন্দিরে পুতুল প্রতিমা প্রতিষ্ঠার কোন সার্থকতা আছে কি? উল্লেখ্য, হযরত ইব্রাহীম ছিলেন মূর্তি ভঙ্গকারী। তিনি আবার মানব জাতির আদি পিতা? আরও উল্লেখ্য, ভারতের রঘুপতি রাঘব, যদুপতি যাদব (যুদাহপতি মুসা) যদি মানব-সন্তানই হন, তা হলে তথাকথিত দেবমন্দিরে মাটির পুতুল গড়ে নতুন করে পূজা- প্রচারের এই হীনমন্যতা কেন?

বিখ্যাত উর্দূ কবি আল্লামা ইকবাল তাঁর 'শিকওয়া' কাব্যে বড় চমৎকারভাবে কথাটি উপস্থাপন করেছেন। যেমন,-

যেইদিন আমি আমি নাই হেথা
দুনিয়াটা ছিল আজব ঠাঁই,
পাষাণে পাদপে মূরতি গড়িয়া
মুর্খ মানব পূজিত তাই।
কেহ কি তোমার মহিমর লাগি
করেছিল তেগ উত্তোলন,
বিকল তোমার সৃষ্টি যন্ত্রে
বাঁধিল নিয়মে কোন সে জান?
হয়ত আজিও হইবে স্মরণ
কাহারা সাধিল এ কাজতোর?
সে কি নহে এই কুলিশ কঠোর
মুসলমানের বাহুর জোর?
সম্পদ লাগি বীর মুসলিম
করিত যদি এ পরাণ পণ
মূর্তি বেপারি না হলে কেন এ
মূর্তি কুরিল চির নিধন?"

(মুহম্মদ সুলতানা অনুদিত শোকোয়া, পৃ.২৫-২৭)

ইদানিং কথায় কথায় মুসলমানদেরকে মূর্তি ভঙ্গকারী এবং ইসলামী সংস্কৃতিকে 'মূর্তি বিধ্বংসন' (Negative) সংস্কৃতি বলে কটাক্ষ্য করা হয় (দ্রে. পৃ. সুনতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, 'সাংস্কৃতিকী' ও 'ভারত সংস্কৃতি', কলকাতা-১৯৬১, পৃঃ ১২৪-১৩৩।) কিন্তু তারা কি জানেন যে, বর্তমান ভারতে নয়, বা উপমহাদেশের কোনো হিন্দু পীঠস্থানে নয়, দুনিয়ার সর্বপ্রথম 'বিশ্ব মূর্তিশালা' গঠিত হয়েছিল মুসলিম পীঠস্থান পবিত্র মক্কা-মুয়াজ্জমায়। আখেরী নবী রসুলুল্লাহ পিতৃপিতামহগণই ছিলেন তার উত্তরাধিকারী আর ভারতীয় হিন্দুগণ আনিত সকল দেব-দেবী মূর্তিই মক্কা মুয়াজ্জমা (কাবা-গৃহ) থেকে গৃহীত?

তাদেরও সকলের আদি পিতাই ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। আল্লামা ইকবাল তাই যথার্থই বলেছেন-

'বুত শিকনী উঠ গ্যয়ে হায়
বাকী জোর রহে ওয়ো বূৎগার হ্যায়
থা বিরহিম পেদর

আওর পেছর আজর হায়।"
অনুবাদঃ মূর্তি নাশক নাহি কেহ আর
আছে যারা তারা মূর্তিকর
আজর আবার জনমিল হয়ে
ইব্রাহিমের বংশধর।
(পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৩)

আজর ছিলেন হযরত ইব্রাহীমের প্রিয় পিতা। শুধু কি তাই? বিশ্বের পৌত্তলিক সাহিত্য ও দর্শনের মূলও যদি আরব-সভ্যতা বলি, তা কি মিথ্যা হবে? আরবের প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন, যা কাবা শরীফের 'ঝুলন্ত কবিতা সপ্তক' (সাব-আয়ে মুয়াল্লাকা') বলে সংরক্ষিত রয়েছে, ভারতীয় হিন্দু কবি কালিদাস ভারত ব্যাস-কল্কিকীর রচনা কি তা থেকে পৃথক? কালিদাসের বিখ্যাত মেঘদূত কি আদি মাতা-পিতা শিব-উমা/আদম হাওয়ার নির্বাসন কাহিনী নয়?

## ৯। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন প্রসঙ্গ

কৌতুহলের ব্যাপার, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম কাব্য, যাকে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, নামে নন্দিত করা হয়েছে, তা কি আসলে আরবী কবি ইমরুল কায়েসের অন্ধ অনুকরণ মাত্র নয়? বলা বাহুল্য, বড় চন্ডীদাস তার কাব্যখানির নামকরণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ বলে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাগবতকারগণ নিশ্চিতই জানতেন যে, ভারতীয় পৌত্তলিক কাম-সংহিতাকে তারা প্রেম সংহিতায় রূপান্তরিত করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় বলা যায়-

"দান খন্ড নৌকা খন্ড নাহি ভাগবেত
অজ্ঞ নহি কহি কিছু হরিবংশ মতে।
আর অপরূপ কথা অমৃতের ভান্ড,
না লিখিল বেদব্যাস এই নৌকাখন্ড
হরি-বংশে লিখিয়াছে করিয়া বিস্তার।
তুংলীয়- "দেবতার বেলা লীলা খেলা
পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।"

এ কথার অর্থ কি? অবশ্য বৈষ্ণতা ভাগবতকারগণও এ-কথাও স্বীকার করেছেন, বিখ্যাত খিল হরিবংশেও এই 'কামায়ণ' অনুপস্থিত। আরবী ভাষা বিশেষজ্ঞগণ নিশ্চিতই জানেন, প্রাক-ইসলামী যুগের কবি (অবশ্য আইয়ামে জাহেলিয়া অন্ধকার যুগের কথা বলাই ভালো) ইমরুল কায়েসের মুয়াল্লাকা

(কায়েস-ওনায়জার প্রেম-কথা) দুনিয়ার যাবত অশালীন সাহিত্যকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, ভাগবতকারগণের দানখন্ড- নৌকাখন্ডে তারই কিছু আভাস মিলেছে। তুং শ্রীকৃষ্ণের বসন-চুরি অধ্যাত্ম অর্থে গ্রহণ করা হলেও ইমরুল কায়েসের কবিতায় বাস্তব ঘটনা। সম্ভবতঃ ফারসী সাহিত্যের লায়লী-মজনু কাহিনীর মূলও ছিল এই কয়েস-ওনায়জার প্রেম কাহিনী।

## ১০। আল্লামা ইকবালের জাভিদ নামা বনাম ডিভাইন কমিডি

এবার আল্লামা ইকবালের জাভিদ নামা থেকে প্রাচীন আরবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উর্ধলোক বিহারী আরব নেতা আবু জাহেলের মুখে সামান্য কথা শোনা যাক। আল্লামা বলেন,- "(আমার ভ্রাতুস্পুত্র) মুহম্মদই আমাদের মূল অন্তর্বেদনার কারণ। তার (অভিনব) শিক্ষা কাবার আলো নিবিয়ে গিয়েছে। সে আরবের ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। সে বলে, অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিভু কাইজার ও খসরুকে ধ্বংস করতে। সে আমাদের যুব-সমাজকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। তার দৌরাত্ম আরবের দেব-প্রতিমা লাতমানাতের উচ্চ মর্যাদা ধ্বংস হয়েছে। হে জগৎ। তাকে সমূলে ধ্বংস কর, তার প্রতিশোধ এগিয়ে এসো। তার ধর্ম আরব জাতির ধর্ম ও বর্ণাশ্রম প্রথার বিনাশ সাধন করেছে। সে যদিও আরবের শ্রেষ্ঠ কুরাইশ বংশোদ্ভুত, তথাপি সে আরবের উচ্চ মর্যাদা অস্বীকার করেছে। সে সমাজের উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ তুলে দিয়ে অন্তঃজদের নিয়ে একই বর্তনে বসে খানা খায় (আবু জাহেলের উক্তি। জাভিদ নামা কাব্য)। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বেই তিনি ভারতীয় মহাঋষির (বিশ্বমিত্র) সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়ে কাল্পনিক কথোপকথন মারফত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বাণী শ্রবণ করেছিলেন। আরও উল্লেখ্য, ইতালীয় কবি দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' কাব্য থেকে আল্লামা ইকবালের মত আবুজাহেলের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে মুহম্মদের ভ্রাতুস্পুত্র (হযরত) আলীর সাক্ষাৎকারের বিবরণও অনুরূপ। কবি দান্তেও ইনফার্নোতে হযরত রসুলুল্লাহ ও তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র আলীর সাক্ষাৎকার বর্ণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, আল্লামার পথ প্রদর্শক ছিলেন ফারসী কবি মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী (১২০৭-১২৭৩) আর 'ডিভাইন কমিডির' ইতালীয় ঈনিড মহাকাব্যের কবি ভার্জিল। এই সঙ্গে ছিল বিখ্যাত দার্শনিক কবি ইবমুল আরাবীর ফুতুহাত' ও সেই সঙ্গে ছিল আরবী কবি আবুল আলা আল মাআররির রিয়ালাতু গুফরান কবিতা গ্রন্থ।

## ১১। সাম বেদ প্রসঙ্গ ওঁ/ ব্যোম, বাঙ ইত্যাদি।

'সাম' বেদের (বাইবেল বর্ণিত 'ওঁ) বীজমন্ত্রে (ওঁকার মন্ত্রে) কুরআনিক তৌহিদের (নিরাকার একেশ্বর ভাবনার) আভাস মেলে। যেমন, 'বিসমিল্লাহ' মানে সৃষ্টিকতা আল্লাহ (ব্রহ্মা) রহমান ও রহীম (দয়ালু ও দাতা/ বিষ্ণু) এই নামের আভাস আছে। যেমন-

"এক ব্রহ্ম বিনে দুই ব্রহ্ম নাই।
সকলের কর্তা এক নিরঞ্জন গোসাঞি।।
সেই নিরাঞ্জনের নাম বিসমিল্লা কয়।
বিষ্ণু আর বিসমিল্লাহ ভিন্ন কিছু নয়।
(সত্যপীর পুথি। তাহির মামুদ সরকার (১১৯০ সাল/ ১৭৮৩)
তুং সুরা ফাতিহার (কুরআনঃ ১-৩) প্রারম্ভিক শ্লোক, যেমন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীমসহ-
"আল্ হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আর রাহমানির রাহীম,
মালিকী ইয়াওমিদ্দিন, ইত্যাদি (কু। ১ঃ১-৩)।

বাংলা অর্থ-শুরু করি সেই আল্লাহতায়ালার নাম নিয়ে, যিনি সর্ব জগতের মালিক, যিনি অত্যন্ত দয়ালু ও দাতা এবং শেষ বিচারের দিনের মালিক (দ্রষ্টব্য-হাশরের দিনের মালিক=মহেশ্বর)। ঠিক যেন রামাঞি পন্ডিতের ব্রহ্মা হৈলা মহামদ বিষ্ণু হৈল পেগাম্বর আদম্প হৈল শূল পানি।- শূন্য পুরাণ।

এর মধ্যে পৌত্তলিকতা নেই। মূলতঃ সকল শাস্ত্রেই আদিতে পৌত্তলিকতা অনুপস্থিত ছিল বলে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রকার মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নও (বেদ-ব্যাসের) সাক্ষ্য দিয়েছেন। দুনিয়ার সর্বশেষ কিতাব কুরআনকে বলা হয়েছে 'কালামুল্লাহ'/ আল্লাহর কালাম। মুসলমানী মতে- 'কালিমাহ' (<হিব্রু) অর্থ বাণী। হিন্দু মতে 'কালিমা'/মানে কালী (আদ্যশক্তি/ মহামায়া) তুং লালনের-

'আছে মায়ের ওঁতে জগৎ পিতা
ভেবে দেখনা'।
তুং ব্যোম, বং/বাঙ-ই-দ্বারা।

এই ওঁ মানেই মাতৃগর্ভ (ওঁ/ওম-ইং Womb) জগৎ পিতা-ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের জন্মও। শব্দটি রূপক। সকল শাস্ত্রেই আছে-মাতৃগর্ভে সন্তানের জন্ম/ অমৃতস্য পুত্রঃ/এই পুত্র মানব সন্তান ব্যতীত নয়।
তুং নজরুল ইসলামের-

"হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কান্ডারী বল ডুবিছে মানুষ
সন্তান মোর মার।"

তুং সম্প্রতি বাণীবদ্ধ (Anjelic Voice) নামা জাতি সংঘের ধ্বনি তরঙ্গ) মাতৃগর্ভের সন্তান-'বেদমাতা'/ উম্মুল কুরআন'।

মায়ের কোন জাত নেই। তুং হাদিসে রসুলুল্লাহ-

"আল জান্নাতু তাহতা আকদাসিমল উম্মিহাত"

মানে, মায়ের পদতলে সন্তানের বিহিশ্‌ত। উম্মুন (<হি. মাতা) উম্মুহাত-বহুবচন-) এবং সৃষ্টিকর্তা তিনজন নয়-এক ও অদ্বৈত মাত্র।

"এক আল্লাহ নিরঞ্জন যার সৃষ্টি ভিভ্রুবন
পরম পুরুষ সনাতন।"
নিরঞ্জুন– আল্লাহ।

-মুসলিম কবি (বুরহানুল্লাহ)

তুং-কুরআনের উক্তি-

"লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ'
মানে, তাঁর বাপ নেই, এবং তিনিও কারও বাপ নন।

-আল কুরআন

## ১২। বিসমিল্লায় প্রসঙ্গ

আল কুরআনের বীজমন্ত্র-
"আউয়ালে বিসমিল্লাহ বর্ত্ম।
জানো আর তার তিনটি অর্থ।

-লালন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এ তিনটি নাম আছে- আল্লাহর গুণ নাম (ইসমি আজম), অর্থ-আল্লাহ, যিনি সমগ্র জগতের স্রষ্টা, রহমান ও রাহীম- দয়ালু ও দাতা আরবী রহম ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন, মর্মার্থ হল-পিতৃ ও মাতৃস্নেহের সম্মিলিত রূপ। মানে, তিনি একাধারে পিতা ও মাতা। এ নিতান্তই ভাষা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। হিন্দু শাস্ত্রে-ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিতান্তই শিশুতোষ ধারণা। ব্যাখ্যা পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে। সংক্ষেপে কথা হল- আল কুরআনে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

## ১৩। মূল 'কালিমাহ' তৌহীদ-প্রসঙ্গ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি-আল্লাহ এক ও অদ্বৈত এবং (শেষ নবী) মুহম্মদ (সঃ) তাঁর দাস ও রসুল-"

জাতপাতহীন আল্লাহ রহমানুর রাহীম ও মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। তুং আল কুরআনের সর্বশেষ বাণী-

"আল ইয়াওমু আকমালতু লাকুম দ্বিনুকুম ইত্যাদি শেষ পর্যন্ত (কুঃ ৫ঃ৩)। অর্থ-আজ তোমাদের জন্য (ইসলাম) পুর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের আমার অনুগ্রহ তামাম করলাম, এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করলাম। (কু। ৫ঃ৩)।

বলা বাহুল্য, কুরআন শুধু মুসলমান নামধারীর জন্য নয়-সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত (তুং ইন্নাদ্দিনা ইনদালাহিল ইসলাম। কু ৩ঃ১৯, ৮০।)

সংকেত-

তুং-তুলনীয়।

কু। ৫ঃ৩-কুরআন। সুরা ৫, আয়াত নং ৩।

>আঃ -আরবী:

>হি-হিব্রু,

>ফা.-ফারসী;

> সং- সংস্কৃত

## ১৪। বিশ্ব কাল পঞ্জী/ কাল পরিচয়

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | আদি পিতা আদম (ADAM) | - | আবির্ভাবকাল হাবুতিসন-১ |
| ২। | হযরত শীশ | - | ১৩০ |
| ৩। | হযরত নূহ (Noa) | - | ১০৫৬ |
| ৪। | হযরত সাম (Shem) | - | ১৫৫৬ |
| ৫। | হযরত ইব্রাহীম (ABRAHM) | - | ১৯৮৭ |
| ৬। | হযরত ইসহাক (Iasq) | - | ২০৮৭ |
| ৭। | হযরত ইয়াকুব (Iacob) | - | ২১৪৭ |
| ৮। | হযরত ইউসুফ (Goseph) | - | |
| ৯। | হযরত মুসা (Mossa) | - | ২৪১২ |
| ১০। | হযরত দাউদ (Devid) | - | ৩১০৯ |
| ১১। | হযরত সুলাইমান (Salomon) | - | ৩১৪৯ |

১২। হযরত ঈসা (Iesus) - ১খ্রী.

১৩। হযরত মুহম্মদ (Muhammad) - ৫৭০ খ্রী.

হিব্রু বাইবেল অনুসারে হযরত মুহম্মদের জন্ম অবধি কাল ছিল ৪০০৪ বৎসর, পারসিকদের হিসাবে ৪৬২২ (৪০০৪+৬২২) বর্তমানে এর সঙ্গে ১৪০১ যোগ করলে হবে ৫৪০৫ হবে। মোটামুটি এই হল মানব জাতির (হযরত আদম থেকে) ইতিহাস। পাশ্চাত্য তৌরাত- বাইবেল মতেও এই হিসাব সমতালীয়। বিশেষ দিনগুলো হল-

(ক) হযরত নূহের তুফান- কুরআনের হিসাব মতে ৩৩৭৫ বৎসর পরে শেষ নবী হযরত মুহম্মদের জন্ম হয় (৫৭০খ্রী. ১২ রবিউল আউয়াল)।

(খ) হযরত ইব্রাহীমের জন্ম এই ঘটনার ২৯২ বৎসর পরে (নূহের তুফানের) (The Bible Genesis pp.10.32) বাইবেল মতে, এই কাল হল হযরত আদম সৃষ্টির ১৬৫৫ বৎসরে (Delue)। মরিস বুকাই-এর মতে, ১৮৫০ খ্রী. পূর্বাব্দে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জীবিত ছিলেন। (Ide Mourice Bucaily. The Bible. The Coran and. Science. pp. 215)। হিন্দু ইতিহাসে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কাল মোটামোটি ১৪০০-১৫০০ (খ্রী-পূ.) (The Hindu History. pp. 269. 272)। হযরত মুসা নীলনদ পাড়ি দেন (লোহিত সাগর) ৯ এপ্রিল, ১৪৯৪ (Buccily. pp.228)।

হিন্দু ইতিহাস থেকে আরও জানা যাচ্ছে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে ত্রিদেবতার উল্লেখ থাকলেও তাঁর পূজা প্রচলন ছিল না (Ibid. pp. 269)। এই দেব পূজা এমন কি ব্রাহ্মণ্যবাদী মূর্তিপূজার শুরু হয় মিসর রাজ ফিরআউনের কাল থেকে। শিব-উমা পূজাও পরবর্তী কালের ঘটনা। ঋক বেদ, এমন কি রামচন্দ্রের জন্মও হয় তার আগে।

শ্রীরাম রঘু বংশের সন্তান, আর পরবর্তী শ্রীকৃষ্ণ যদু বংশের। হিব্রু ভাষায় 'যুদাহ (>আ. ইয়াহুদা) নামের রূপান্তর। হযরত মুসা ছিলেন যুদাহ-বংশের সুসন্তান। যুদাহ ছিলেন হযরত ইয়াকুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র (>ইয়াহুদা)। কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন হযরত ইউসুফ (আঃ)। সুরা ইউসুফে তার বিস্তারিত বিবরণ আছে (অনুপম মানবিক কাহিনী)। ভারতে রাম ছিলেন কুশল-নৃপতিপুত্র (কৌশল্যা-পুত্র) রাম, আর ইউসুফ ছিলেন ইয়াকুবের প্রিয় পত্নী রাহিলা নামক স্ত্রীর গর্ভজাত। রামচন্দ্রের লক্ষ্মণ ভাইয়ের মত বনী আমিন ভাইয়ের কথাও জানা যায়। তুং-সত্য পীরের কাহিনীতে কবি লিখেছেন- 'মক্কার রহীম আমি অযোধ্যার রাম'।

এছাড়া হযরত মুসার প্রতিদ্বন্দ্বী ফিরাউনের নাম ছিল রামাসিস-৩' পূর্বতন নবী হযরত ইউসুফ তাঁর পূর্বতন (রামাসিস-২) রাজার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। বাইবেল মতে, দ্বিতীয় নয়-তৃতীয় রামাসিসই খুদাই দাবি করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুকাল ছিল- ১৪৯৫ খ্রী. পূর্বাব্দ।

সম্প্রতি হযরত হুদ নামক নবীর আমলের খোদাই দাবিকারী শাদ্দাদের সিংহাসনের ধ্বংসাবশেষ ওমান রাজ্যের হাদ্রামাউথে আবিষ্কৃত হয়েছে।

হাদ্রামাউথে হযরত হুদের কবরও আবিষ্কৃত হয়েছে। শাদ্দাদ পূর্বতন আদি জাতির দুর্দ্ধর্ষ রাজা ছিল।

শাদ্দাদের উত্তরাধিকারী ছিল হযরত ইব্রাহীমের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা নিমরূপ। যার সময়ে সর্বপ্রথম পূর্তি পূজার প্রবর্তন হয়। শহরে বায়াল দেবতা তুং বায়ালো বাক্কা/বাক্কা/মক্কা। হযরত নূহের পুত্র সামের বংশে শাদ্দাদ নিমরুদ এমনকি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর আবির্ভাব হয়। নিমরুদের পরে 'ফিরআউন'।

**খ্রী. পূ. ৫৪০- ভারতে বুদ্ধদেব ও চীনে কংফুসের আবির্ভাব**

— ৪০০ সাল থেকে গ্রীসে সক্রেটিস, প্লেটো অ্যারিসটটল প্রভৃতি আবির্ভাব।

— ৩৩০ অব্দে গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের ভারতে আগমন (সিকান্দার শাহ)।

**খ্রীষ্টাব্দ -১ হযরত ঈসা/ যিশু খ্রীষ্টের জন্ম**

— ৩৭ হযরত ঈসার তিরোভাব, খ্রীষ্টাব্দের শুরু ৩৭ খ্রী.। শেষ নবী হযরত মুহম্মদের আবির্ভাব ৫৭০ খ্রী.

কুরআনের বাণী প্রচার- (নুযুলে কুরআন) ৬১০-৬৩২ খ্রী.

হিন্দু ধর্মের শেষ অবতার-কাল্কির আবির্ভাব (৬২২ খ্রীষ্টাব্দে?) হিজরী/ বাংলা সনের সূত্রপাত।

আজ বাংলা সনের ১৪০৫ সাল / হিজরী ১৪১৯ সাল (=১৯৯৮-৯৯)। (দ্র. মৎলিখিত বাংলা সনের জন্ম কথা। বা-এ, ১৯৭৭)।

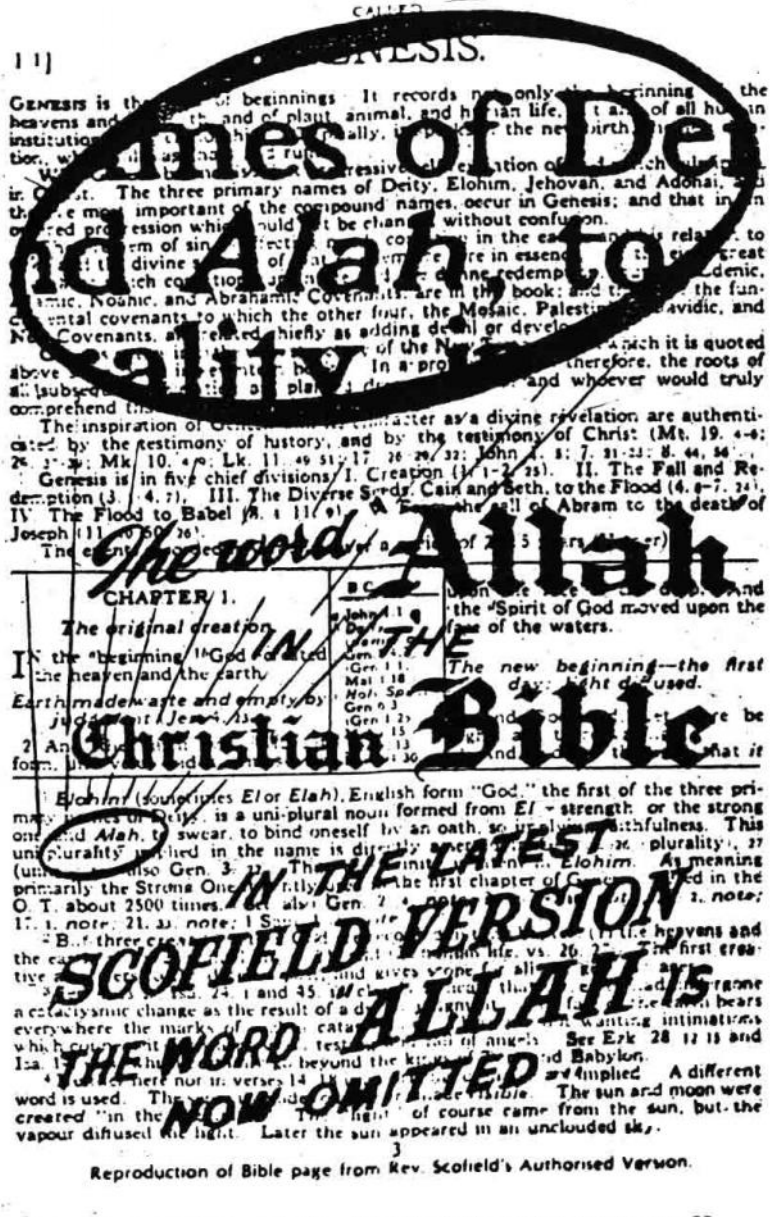


Reproduction of Bible page from Rev. Scofield's Authorised Version.

Ref. THE CHOICE Compiled by : International Promoters, London pp: 22

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

**THE EXACT NO. OF TIMES EACH WORD OF THE ABOVE FORMULA OCCUR IN THE HOLY QURAN**

**19 TIMES ( 19 x 1 )** — اِسۡمِ
Meaning "NAME"

**2698 TIMES (19 x 142 )** — اللهِ
Meaning "GOD"

**57 TIMES ( 19 x 3 )** — الرَّحۡمٰنِ
Meaning "THE MOST GRACIOUS

**114 TIMES ( 19 x 6 )** — الرَّحِيۡمِ
Meaning "THE MOST MERCIFUL"

عَلَيۡهَا تِسۡعَةَ عَشَرَ ۝

30. Over it are Nineteen. H.Q. 74:30 ٣٠- عَلَيۡهَا تِسۡعَةَ عَشَرَ ۝

Ref. THE CHOICE Compiled by : International Promoters, London, pp. 22

আল-কুরআনের মোট ২৮টি অক্ষর
সাধারণ অক্ষর ১৪টি

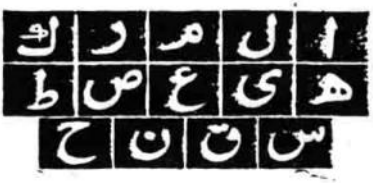

ও সমন্বিত ১৪টি বিভিন্ন আরবী অক্ষর
(হরুফউল মুকাত্তায়াত) দি চয়েচ, পৃঃ ৩১৫

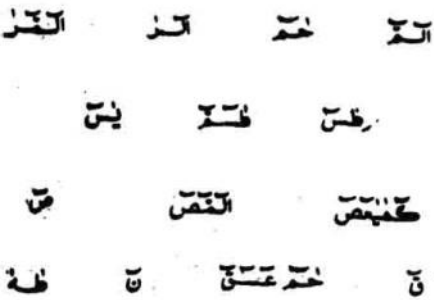

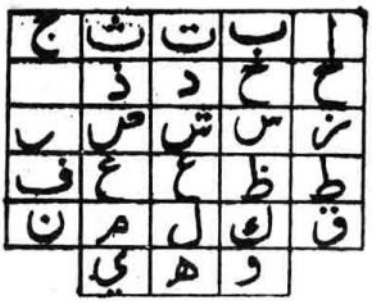

# তৃতীয় খন্ড

# বিভ্রান্ত বাঙালী

(অপ্রকাশিত, রচনাকাল ১৯৯৭)

# বিভ্রান্ত বাঙালী

প্রখ্যাত বাঙালী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিলেত-প্রবাসকালীন সময়ে তাঁর এক বন্ধুকে এক চিঠি লিখলেন এই বলে, 'আমার মুসলমান বন্ধু আবদুল লতিফের খবর কি? সে কি আজও 'বিসমিল্লার মানুষ' হয়ে আছে, না এতদিনে মদ ও শূকরের মাংস ধরেছে? সাধু সংবাদ বটে! মুসলিম জননেতা মনীষী আব্দুল লতিফ (নবাব) কি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে 'মদ ও শূকরের মাংস' খাওয়া শুরু করেছে?' এটি অবশ্য মধুসূদনের আত্মবাসনা চরিতার্থক উক্তি, ইংরেজিতে যাকে 'Wishful thinking' বলে, তাই। অর্থাৎ হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান মধুসূদন সদ্য পৌত্তলিক হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ত্রিত্ববাদী খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে উল্লিখিত 'মদ-মাস' ধরেছিলেন (১৮২৪-১৮৭৩)। খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণান্তর তাঁর নামও হয়েছিল 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত'। ধর্মান্তরিত হয়ে তিনি বিলেত গিয়েছিলেন। ব্যারিস্টারী পেশায় তেমন পসার করতে না পারলেও তিনি কবি হিসেবে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিলেন।

আমার বক্তব্য তাও নয়। তবে কথা হচ্ছে, মধুসূদন-মানসে মুসলিম ধর্মবিদ্বেষ কিছু মাত্র ছিল, এ কথা ভাবতেও কষ্ট হয়। কিন্তু তাঁর বাঙালী মুসলমান বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠিতে যা অভিব্যক্ত হয়েছে, তার কি ব্যাখ্যা দেয়া যায়?

নবাব আব্দুল লতিফ ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ মুসলমান সমাজসেবক এবং একজন লেখকও। তাঁর জন্ম হয় ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। তাঁর পিতাও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাঁরা দিল্লীতে আসেন। তাদের একজন মুঘল শাসকদের অধীনে কাজী হিসেবে ফরিদপুরে আসেন। আব্দুল লতিফ এই পরিবারেরই সন্তান।

কলকাতা মাদ্রাসা থেকে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করে প্রথমে তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজী ও আরবীর অধ্যাপক (১৮৪৮) ও পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে যোগদান করেন। ১৮৫২ সালে তিনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিচারপতি পদও লাভ করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে উপমহাদেশের মুসলমান সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের নিমিত্ত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সাহিত্য সমাজ গঠন করেন। বলা বাহুল্য, এই সমাজকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশে মুসলিম সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের পথ প্রশস্ত হয়।

বলা যেতে পারে, তারই প্রভাব বলয়ে পরবর্তীকালে স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন ও মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও গাজীপুরে 'বিজ্ঞান পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও পরবর্তীকালে ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ (১৯২৬-১৯৩৬) প্রতিষ্ঠাকেও তার ফল বলা যায়। উপমহাদেশের মুসলমানদের অশেষবিধ কল্যাণ কামনায় নিবেদিত প্রাণ এই মহামনীষী নবাব আব্দুল লতিফ ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে ১০ জুলাই তারিখে ইন্তিকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে....)।

সমকালীন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নওয়াব (নবাব) উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। সাহিত্য-সমাজে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), স্যার সৈয়দ আমীর আলী, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক (১৮৩৮-৯৬) ছিলেন। তাই নবাব আব্দুল লতিফের মত একজন সমাজ সচেতন, মানব দরদী মনীষীকে নিয়ে মাইকেল মধুসূদনের এ মন্তব্য নিতান্তই দুঃখজনক।

আরও দুঃখজনক যে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সেই বিসমিল্লাহকে নিয়ে তুলকালাম কান্ড শুরু হয়েছে। একথা দুঃখজনক হলেও সত্যি, স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বর্জিত হয়েছিল।

সমকালীন বাংলাদেশী জননেতাগণ 'বিসমিল্লাহ-বর্জিত' সংবিধান তৈরি করে সত্য, ন্যায় ও পবিত্র দেশমাতৃকার নামে রাজনীতি করেছিলেন। তাতে বিসমিল্লাহকে সাম্প্রদায়িক মনে হতে পারে। মাফ করবেন, আমি কারো ধর্ম বা রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি কিছুমাত্র কটাক্ষ না করেই বলতে পারি, পরবর্তীকালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে যখন 'বিসমিল্লাহ'র (বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম) দাবি সংবিধানের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন যাঁরা বিরূপ হয়েছিলেন, তাদের জন্য দুঃখ বোধ হয়। বলা বাহুল্য, এরই সূত্র ধরে আমাদের দত্ত বন্ধুরা, এই সেদিনও 'বিসমিল্লাহ বিরোধী' স্লোগান তুলেছিলেন; তাও কি কবি মধুসূদনের বিসমিল্লাহ্ বিরোধী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ নয়? শুধু নবাব আব্দুল লতিফ নয়, ইসলামের মূল কলিমাহ/মন্ত্রই হল- 'বিসমিল্লাহ' একথা কি মুসলমানরা ভুলতে পারে? তুং মরমী কবি লালন ফকিরের ভাষায়- আউয়ালে বিসমিল্লাহ বর্ণ্ম। আর জানো তার তিনটি অর্থ।'

আউয়াল (আ. অর্থ প্রথম), বিসমিল্লাহ অর্থ আল্লাহ'র নামে শুরু করছি, যিনি সর্বজগতের স্রষ্টা, মালিক, দয়ালু ও দাতা। তাই মুসলমানের জন্য 'বিসমিল্লাহ গলদ' একটি বড় অপরাধ নয় কি? তাই বলে এ নিয়ে ঝগড়ার কি আছে?

কিন্তু অবুঝ মানুষ এ নিয়ে মিথ্যার বেসাতি করেছে। ফলে ঘটেছে 'বিসমিল্লায়

গলদ'। বাংলা নামান্তর গোড়ায় গলদ। সত্যি বলতে কি, কুরআনের ভাষায় হিন্দু শাস্ত্র বেদের আদ্য বাণীই (ওঁ) হিব্রু বা আরবী ভাষায় হয়েছে 'বিসমিল্লাহ'। হিন্দু/সংস্কৃত ভাষায় যার অর্থ হল 'ওঁ শান্তি'। অর্থ একই। স্বস্তি বচন। 'বিসমিল্লাহ' হল কুরআনেরও আদ্য বাণী। মানে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ যিনি পরম দয়ালু ও পরম দাতা, তাঁর নামে শুরু করছি। বেদের বাণী 'ওঁ' শব্দের অর্থও আদিতে তাই ছিল।

পরবর্তীকালে ওঁ/অ+উ+ম আল্লাহ নামকে তিনভাগে বিভক্ত করে তিন দেবমূর্তি কল্পনা করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর/সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা নামসমূহের উৎপত্তি। নেহায়েৎ শিশুতোষ পৌত্তলিক কল্পনা বৈকি। সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন যার প্রতিবাদ করা হয়েছে। বলা হয়েছে- বিসমিল্লাহ পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালারই একটি গুণনাম। অর্থ-তিনি আল্লাহ এক ও অদ্বৈত প্রভু, তিনি সকল জগতের অত্যন্ত দয়ালু ও পরম দাতা। তাঁর কোন রূপ ও রেখা নেই। কুরআনের প্রথম অধ্যায় বা সূরার নামই বলা হয়েছে 'সুরা ফাতিহা।' প্রারম্ভিক অধ্যায়, যার নামান্তর উম্মুল কুরআন/ কুরআন/ জননী। খ্রীস্টান ও হিন্দু শাস্ত্র-সাম, বেদের প্রারম্ভিক বাক্য ছিল গায়ত্রী। বেদ মাতা। মর্মার্থও আদ্যে একই ছিল (তুং একমদ্দীতিয়ম) এক ও অদ্বৈত প্রভু তিনি। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। পবিত্র কুরআনের সাক্ষ্যও তাই। অনেকেরই হয়ত জানা নেই, খ্রীষ্টান ত্রিত্ববাদী/ ত্রিশ্বরবাদ মূল বাইবেলেই অনুপস্থিত। খ্রীস্টান পাদ্রি সেন্টপল এই অভিনব মতবাদের সৃষ্টি করেছেন এবং সেটি ঘটেছে হযরত ঈসা/যীশু খ্রীস্টের তিরোধানের পরে।
উল্লেখ্য, ভাস্কর্য শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে আদিকাল থেকেই, তবে যাকে মূর্তি পূজা বলে, তার প্রবর্তন হয়েছে অনেক পরে। কুরআনেও তার সাক্ষ্য মেলে। তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা করলে দেখা যায়, মিসরের খোদাদ্রোহী 'ফিরআউন' (রামাসিস-৩) এর আমলে মূর্তি পূজা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচলিত হয়েছে। কৌতুহলের ব্যাপার, আদিতে সকল ধর্মই এক ও অভিন্ন ছিল। স্রষ্টাও ছিলেন এক ও অদ্বৈত। বিভ্রান্তি ঘটেছে পরে (কুরআন/ সুরা ৪৩ঃ ২১-২২)। (তুং 'দেবতারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে গড়েছি খেলনা' রবীন্দ্রনাথ)। যে বিসমিল্লাহ নিয়ে কথা উঠেছে, সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনে তাকে আল্লাহর 'কালাম' আদ্যবাণী 'কালিমাহ্' বেদ মতে 'কালীমা' নামে অভিহিত হয়েছে। এটি আরবী। হিব্রু/'কালিমাহ' শব্দের অপভ্রংশ (কলিমা বা বাগেদবী/বাণী মূর্তি) হিসেবে দেখা দিয়েছে। নামান্তর-গায়ত্রী/ বেদমাতা, শাস্ত্রগ্রন্থ বেদের 'মা' বলা হয়েছে। মা বলতে মাতৃমূর্তি কল্পনা করে তার পূজা প্রচার করা হয়েছে, যা শ্রী মদ্ভাগবতেও শিশুতোষ/ অপরা পূজা বলা হয়েছে।

পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআনেও কথাটি বলা হয়েছে কুরআন জননী/ 'উম্মুল

কুরআন' বলে। এখানে জননী একটি গুণনাম। ব্যক্তিত্ব নয়। প্রথমটিতে শিল্পরূপে পূজা প্রচার (শিশুতোষ) করা হয়েছে, আর কুরআনে বলা হয়েছে নিরাকার বাণীরূপে। তারই নাম 'বিসমিল্লাহ', বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। শিশুতোষ কল্পনায় আদ্যবাণী মাতৃরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু বাণীর কোন রূপ ও রেখা নেই। কারণ সমস্ত অসীম স্রষ্টা 'আবাঙ মানস গোচর'/বাক্য ও মনের অতীত (তুং 'নিরুপম সৌন্দর্য প্রতিমা'-রবীন্দ্রনাথ। এবার ফিরাও মোরে কবিতা- চিত্রাকাব্য)।

পবিত্র বাইবেল ও কুরআন থেকে জানা যায়, হযরত মূসা (আঃ)-এর অবহারিত 'তওরাত' কিতাবই বিশ্বের আদি গ্রন্থ। সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকে 'আল্লাহ'/ বিসমিল্লাহ নামের প্রথম উল্লেখ সেখানেই মিলেছে। ফিরাউন বলত মূসার আল্লাহ/ প্রভু। কাসাসুল আম্বীয়া ইত্যাদি কিতাবে বলা হয়েছে, ফিরাউন-পত্নী হযরত আসীয়া এই নাম উচ্চারণ করার জন্য নির্মমভাবে নিহত হন। মুসা হয়েছিলেন বিতাড়িত। কিন্তু কেউ সে নাম ছাড়েননি। কৌতূহলের ব্যাপার, পবিত্র বাইবেল কিতাবে 'আল্লাহ' নামটিই ব্যবহৃত হয়েছিল (এলি, এলাহ, আলাহ নয়- আল্লাহই ব্যবহৃত ছিল)। ঐতিহ্য সূত্রে জানা যাচ্ছে, বাইবেলে গ্রীক ভাষায় রূপান্তরকালে এটি বাইবেল থেকে চিরতরে বর্জিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য- মূর বাইবেলের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির একটি পৃষ্ঠা-উদ্ধৃত The Cloicc, London, pp 22) তাই নবাব আব্দুল লতিফকে যথার্থভাবেই 'বিসমিল্লাহর মানুষ' অভিহিত করা যায়।

পরিশেষে উল্লেখ্য, আমাদের ধর্মবেত্তা পণ্ডিত-সমাজ যাই বলুন না কেন, মধ্যযুগীয় বাঙালী (মুসলিম) কবি তাহির মামুদ সরকার যথার্থই বলেছেন-

এক ব্রহ্ম বিনা আর দুই ব্রহ্ম নাই।
সকলের কর্তা এক নিরঞ্জন গোসাঞি।
সেই নিরঞ্জনের নাম বিসমিল্লাহ কয়।
বিষ্ণু আর বিসমিল্লা ভিন্ন কিছু নয়।
(সত্য পীরের পুথি। মুহম্মদ আবু তালিব।
উত্তরবঙ্গে সাহিত্য সাধনা। রাজশাহী ১৯৭৫, পৃ)।
তুং এক আল্লাহ নিরঞ্জন
যার সৃষ্টি ত্রিভুবন
পরম পুরুষ সনাতন।
(দ্রঃ বুরহানুল্লাহ। কলমী পুঁথি)

তাঁকে যে নামেই ডাকা হোক, আল্লাহ একমাত্র আল্লাহই।

তুং লালনের গান-

'অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণ নিধি
তারে কি সাজে কভু গোষ্ঠ লীলা।
ব্রহ্মরূপে সে অটলে বসে
লীলাকারী হয় তার অংশ কলা।
পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণ সে রসিক শেখরে
শক্তির উদয় যাহার শরীরে।
লংঘিতে সৃজন মহা আকর্ষণ
বেদাগমে যারে বিষ্ণু বলা। -লালন শাহ

এখানে-অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণ। এই কৃষ্ণ/বিষ্ণু-বৈষ্ণবীয় শ্রী বৃন্দাবনের গোষ্ঠের রাখাল মাত্র নন- বিসমিল্লাহ/ সর্বশক্তিমান আল্লাহ'র প্রতিশব্দের ভাস্কর্য' রূপ/ পুতুল প্রতিমামাত্র নয়।

বেদ ও আগমণ= বেদাগম।

## বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও জাতিতত্ত্বের আদ্য কথা

অধুনা বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙালী বলতে বাংলাদেশী নামে এক নব অভ্যুদিত দেশের অধিবাসী বোঝায়। বাংলা ভাষা বলতেও তাই- বাংলা নামক দেশের ভাষা (বাংলাদেশী)। অতীতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এতটুকু যে এ দেশে তাদের পূর্ব পুরুষদের আদি নিবাস ছিল (তুং কুরআনের 'আসাতিরুল আওয়ালীন')।

বহু ত্যাগ তিতিক্ষা ও বিবর্তনের মাধ্যমে তাদের অভ্যুদয় ঘটেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এ দেশে জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতিসমূহের আদি নিবাস ছিল। বিচিত্র তাদের ধর্ম চিন্তা বিচিত্র তাদের জীবনাচরণ।

সব শেষে এদেশে মুসলমান নামক এক নব অভ্যুদিত জাতির আগমণ ঘটেছে। এ দেশের ইতিহাস এই নব অভ্যুদিত বাংলাদেশের ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনাচরণের ইতিহাস। এদের আগমণ কাল খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের দিকে। বলতে গেলে বখ্‌তিয়ার খালজীর গৌড় বিজয়ের পর থেকে (৬০০ হি./ ১২০৩-৪) এ।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গবীর শের-ই-বাংলার নেতৃত্বে উপমহাদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আচার-আচরণ ও আগ্রাসনের অবসানকল্পে

ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোরে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের অধিবেশনে (লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০) ভারত-বিভক্তি ও দু'টি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, বহু ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে এবং সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ নেতা কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ক্ষুরধার নেতৃত্বে রক্তবিহীন এক বিপ্লবের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হয়। নাম হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্র। যার মূলে ছিল প্রাক-ব্রিটিশ আমলের সুবায়ে বাংলা (বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা)। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম প্রধান পাকিস্তান হবে ভারতীয় মুসলমানদের এবং হিন্দু প্রধান সর্বভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়সমূহের স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্র। (১৪, ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ খ্রীঃ)।

স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হল তারই উত্তরাধিকারী (পূর্ব পাকিস্তান)। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পদিন যেতে না যেতেই সেই স্বাধীন পাকিস্তানের স্বপ্ন উবে গেল! রক্তাক্ত এক বিপ্লবের মাধ্যমে পাকিস্তানও বিভক্ত হয়ে এক নবীন বাঙালী/ বাংলাদেশী রাষ্ট্র সত্ত্বার জন্ম হল। নেতৃত্ব দিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (২৬ মার্চ, ১৯৭১)। ভারত সরকার বিভক্ত না হলেও জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা-জর্জর ভারতভূমিও নতুনতর রাষ্ট্র সত্ত্বা লাভের প্রচেষ্টায় আজ দিশেহারা। সে অন্য কথা।

আমাদের বক্তব্য ভিন্ন। বাংলা ও বাঙালী নামে যে নতুন রাষ্ট্র সত্ত্বার আবির্ভাব ঘটেছে, তা কি নতুন কিছু? পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও কি বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন জাতীয় আদর্শ নিয়ে টিকে থাকতে পারবে? অন্ততঃ ইতিহাস তার বিপরীত সাক্ষ্য রাখে। (এপার বাংলা ওপার বাংলা নয়)। তাই বৃহত্তর বাঙালী, বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আমার এ আলোচনার সূত্রপাত।

বলা বাহুল্য, 'জাতি' বলতে এখানে ইংরেজি নেশন/Nation বুঝতে হবে। অথচ এই নেশন হুড (Nation hood) আমাদের অন্তরে নেই, আমাদের দেশে ছিল না। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব এবং পাশ্চাত্য জীবনের আলোকে বর্তমান দুনিয়ায় ন্যাশনাল মাহাত্ম্যে উদ্বোধিত নবীনতর নেশন/ জাতিসমূহ গঠিত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, বাংলাদেশ-পাকিস্তান-ভারতে এই ন্যাশনাল অনুভূতি হয়েছে ভিন্নতর। আমরা স্বীকার করতে না চাইলেও পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জাতিসমূহ এক ভিন্নতর ধারায় প্রবাহিত। তাই বাঙালী তথা পাক-ভারতীয় জাতীয়তা সম্পর্কেও সে কথা খাটে। আমরা যতই ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা করে এক জাতীয়তার (One Nation) দোহাই দিই না কেন, আমাদের অন্তরে ধর্ম বিশ্বাস বলতে এক ও অবিভাজ্য স্রষ্টার উপলব্ধি

আছে। তা সুস্পষ্ট দুই ধারায় প্রবাহিত-তৌহীদ আর বহুত্ববাদ।

তৌহীদে আল্লাহতায়ালার যে মৌলিক একত্ববাদের ধারণা আছে, বহুত্ববাদ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এর মূলে যে ঐক্য আছে, তাও বিভ্রান্তির জটাজালে আবৃত। তাই এই তৌহীদ ও বহুত্ববাদী সমস্যার সমাধান ছাড়া কোন সুদৃঢ় জাতীয়তা গড়ে উঠতে পারে না। কথাটি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম অতি চমৎকারভাবে অভিব্যক্ত করেছেন, যথা-

"তৌহীদ আর বহুত্ববাদে
বেঁধেছে আজিকে মহা সমর
লা শরীক এক হবে জয়ী
কহিছে আল্লাহু আকবর।
জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে
অন্ধকারের এ ভেদ জ্ঞান
অভেদ আহাদ মন্ত্রে টুটিবে
মানুষ হইবে এক সমান।"

কেমন করে?

"এক সূর্যের দেখ অনন্ত রঙ
তবু তারা
পরম শুভ্র এক রঙে হয় একাকার
রং হারা।"

কিন্তু কে তাদের এই রঙহারা ঐক্য রঙের সম্মিলন ঘটিয়ে মানুষে মানুষের ভেদাভেদ ঘুচাবে? সে কথা এখন থাক, এবার মূল কথায় আসা যাক।

ইসলামে কওম/ কওমিয়াত বলতে একটি কথা আছে। বাংলা ভাষায় তাকে জাতি, ইংরাজি Nation নেশন বুঝানো যায়। পবিত্র আল কুরআনে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ বলেন, 'লেকুল্লে কাওমিন হাদ' (কু। সুরা রাদ ১৩ঃ৭)। মানে প্রত্যেক জাতির কাছে আমি হাদী/ পথ প্রদর্শক (নবী- পয়গম্বর) পাঠিয়েছি। শুধু তাই নয়, তাদের জন্য বিশেষ বাণীও পাঠানো হয়েছে। যেন তারা সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের পথ-নির্দেশ দিতে পারে। যেমন-

"অমা আর্সলনা মির্রসূলীন, ইল্লা বে লিসানি কাওমিহীম লেইউ বাই উল্লাহুম। (কু। সুরা ইব্রাহীম ১৪ঃ৪)।

পরিশেষে উল্লেখ্য মাতৃপূজা, দেব-দেবী বা প্রকৃতি পূজা কেবল মাত্র ভারতবর্ষেরই বৈশিষ্ট্য ছিল না, আদ্যাশক্তির নামে কালিকা পূজা, আরবের

লাত-মানাথ- ওজ্জা হোবলের পূজার সঙ্গে ভারত বর্ষের হর-গৌরী/ শিব-উমার পূজারও সাদৃশ্য আছে।

ভারত বর্ষের ওঁ (ওম) মন্ত্রের উমা শব্দের অর্থই ছিল মাতৃমূর্তি। আরবী বা হিব্রুতে উম্মুন্ন অর্থই ছিল মাতা। মায়ের গর্ভেই সন্তানের জন্ম।

তুং হাদিস শরীফের উক্তি-

"আল জান্নাতু তাহতা আকদামিল উম্মিহাত।" মানে, বিহিশ্‌ত মাতৃজাতির পদতলে অবস্থিত। এই মা মাতৃমূর্তি নয়- গর্ভধারিণী জননী/ মা। উম্মুর শব্দের মৌলিক আরবী অর্থই হল সন্তান জননের আদ্য স্থান। আরবী মৌলুদ শরীফে এই অর্থেরই অভিব্যক্তি ঘটেছে।

মাতৃগর্ভ পূজা নয়-আল্লাহ রসুলের মহিমা প্রকাশ এখানে লক্ষ্য। মার্তপূজার মূল কথাও তাই।

জার্মান কবি মহামতি গ্যেটে যথার্থই বলেছেন, ইং Womb শব্দ থেকে উম্মুন (>AUM) শব্দের উদ্ভব ঘটেছে। Womb মানে মাতৃগর্ভ। তাই মাতৃগর্ভ সন্তানের জন্য স্বর্গতুল্য পবিত্র স্থান। সংস্কৃত সাহিত্যেও বলা হয়েছে, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এর মানে জননী বা জন্মভূমিই স্বর্গ ভূমি নয়, স্বর্গতূল্য স্থান।

সম্ভবতঃ মাতৃপূজার উদ্ভব এ থেকে হতে পারে। কিন্তু ইসলামে জননী ও জন্মভূমিকে সন্তানের স্বর্গ বলা হলেও তাকে স্বর্গের বাড়া বলা হয়নি, বলা হয়েছে স্বর্গতুল্য।

তুং নজরুল ইসলামের-

" হিন্দু না ওরা মুসলিম
ওই জিজ্ঞাসে কোন জন,
কান্ডারী, বল ডুবিছে মানুষ
সন্তান মোর মার।

জাতি ধর্ম (হিন্দু-মুসলমান) প্রশ্ন এখানে অবান্তব। এই সন্তান-জননীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনই মানব সন্তানের অবশ্য কর্তব্য। তাই বলে তাকে মাটি পাথরের মূর্তি গড়ে ভগবান বা ভগবতী বলে পূজা দেওয়া কেন? মাটির পুতুল কখনও মানুষই হয় না, ভগবান তো দূরের কথা।

আদি পিতা-মাতা, আদম-হাওয়া বা ইব্রাহীম-হাজিরার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

থেকে মাতৃকা পূজার প্রবর্তন হওয়া সম্ভব। তবে সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থে খুদাতায়ালা ব্যতীত অন্য কারো প্রতি আত্ম নিবেদনকেই পূজা বলা হয়েছে। মা বলতে এখানে আদ্য শক্তি মহামায়া জগদ্ধার্থী (কালিকা) বুঝায়। পক্ষান্তরে ইসলামে আল্লাহ ব্যতীত গায়র আল্লাহর প্রতি আত্ম নিবেদনকে কুফুরী বা গুণাহের কাজ বলা হয়েছে।

আল্লাহ ছাড়া দোসরা মাবুদ বা উপাস্য নেই। জগতের ইতিহাসে ইব্রাহীম-ইসমাঈলের কুরবানীই এখানে লক্ষ্য।

আম্মা হাজিরা, আব্বা ইব্রাহীম ও তৎ পুত্র ইসমাঈলই এখানে কুরবানীর পশু (রূপক অর্থে প্রযোজ্য)।

তুং কুরআনের বাণীঃ

পূর্বে বা পশ্চিমে কোন পূণ্য নেই, প্রকৃত কুরবানী হল অন্তরের আত্ম নিবেদন।

পুতুল-প্রতিমা পূজারীরা একটি কথা ভুলে যান বা বিশ্বাস করতে চান না যে, ভগবান মানুষ গড়েছেন, মানুষের পক্ষে ভগবান গড়া সম্ভব নয়।

আর মাটি-পাথর তো নির্জীব। নির্জীব পুতুল প্রতিমাকে পূজা দেয়া সৃষ্টির সেরা মানুষ জাতিরই অপমান, একথা কি মানুষ বুঝেও বুঝতে পারে না।

তুং আল্লামা ইকবালের বাণীঃ

"পাথরকে মূর্তি উমে সমঝা হ্যায়
তু খোদা হ্যায়।
যাকে ওয়াতান মেরা
হর যার্রা দেওতা হ্যায়।"

মানে, পাথরের মূর্তিকে তুমি খোদা বল, কিন্তু আমার কাছে স্বদেশের প্রতি ধূলিকণাই দেবতা। ইসলামের দৃষ্টিতে-দেবতা, খোদা ও মানুষের পার্থক্য এরূপ।

মহাত্মা কবীরও বলেছেন-

পাথর পূজে হরি মেলে তো
হম পূজেঙ্গে পাহাড়।'

এখানে পৌত্তলিকতা অনুপস্থিত। যেমন, "অমা আর্সলনা মির্রূরসূলীন, ইল্লা বে লিসানি কাওমিহীম লে উই বাই উল্লাহুম।" (কু। সুরা ইব্রাহীম ১৪ঃ৪)।

তুং নবী বংশ, সৈয়দ সুলতান-

"আল্লাহ বুলিছে মুঞি যে দেশে যে ভাষ।

সে দেশে সে ভাষে কৈলুঁ রসুল প্রকাশ॥
এক গ্রাষে পয়গম্বর এক ভাষে নর
বুঝিতেন পারিব উত্তর পদুত্তর॥'

বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ, রব্বুল আলামীন যুগে যুগে নবী- পয়গম্বর পাঠিয়ে যুগ বাণী পাঠিয়েছেন। তারা আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক পথ-প্রদর্শন করে থাকেন। বলা বাহুল্য, এই বাণী সকল জাতির জন্য অভিন্ন হলেও দুর্ভাগ্যক্রমে তার মধ্যে নানা বিভ্রান্তি প্রবেশ করে যুগ-মানবদেরকে নানা বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত করেছে। ফলে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, হানাহানি, মারামারি লেগেই আছে।

অধুনা দুনিয়ার বসনীয়া-হার্জেগোভিনা, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, রাশিয়া, চেচনিয়া তারই সৃষ্টি। অথচ দুনিয়ার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত ধর্ম গ্রন্থসমূহের উক্তিও সমমর্মীয় সূত্রে অভিব্যক্ত হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা আজ ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিবেশিত হয়ে বিভ্রান্তি কেবল বাড়িয়েই তুলছে নইলে জগৎ স্রষ্টা এক ও অদ্বৈত হলে তাঁর বাণী ভেদ হবে কেন? আর যুগে যুগে তা ভিন্নই বা হবে কেন?

তুং লালন ফকিরের প্রশ্ন ঃ

"কি কালাম পাঠাইলেন আমার
সাঁই দয়াময়।
এক এক দেশে এক এক বাণী
কোন খোদা পাঠায়॥"

শুধু কি ভাষার ক্ষেত্রে? জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এই বিভ্রান্তি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে জাতি ধর্মের নামে চরম অশান্তির বীজ বপন করে চলেছে। বাংলাদেশে মুসলিম সভ্যতা ও মুসলিম আধিপত্য কায়েমের আগে এদেশে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শাসন কায়েম হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতকে এই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের সংঘর্ষে বাংলাদেশ যে চরম বিভ্রান্তি দেখা দেয় তারই পরিণামে দ্বাদশ শতকের শেষার্দ্ধে ঘটনাচক্রে আসেন সুদূর আফগানিস্তান থেকে খালজী বীর বিন বখ্‌ত ইয়ার। আমরা আরও জানি, ব্রাহ্মণ্য শাসনের জগদ্দল শিলার চাঁপে বাঙালী তথা বিশ্ব মানবতার চরম অবমাননার ধারা চালু হয়েছিল।

বাঙালী/বাঙাল শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? বঙ্গে ক্ষেত্রের আল বাঁধা থেকে 'বাঙাল'/ বাঙ্গাল শব্দের ব্যুৎপত্তি নয়, মনে হয় সুদূর অতীতে 'বাং' বা 'বঙ' নামক গো ীর আহাল (>আ. অর্থ বংশ) থেকে 'বাঙ্গাল' বলতে দোষ কি?

পাশ্চাত্য দেশের হিন্দু/ য়িহুদীবাদ সম্পর্কেও যে কথা খাটে। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রেই তার দোলা লেগেছিল। গৌড়-বিজয়ী বখ্‌ত ইয়ার খালজীর আগমনে বিশ্ব মানবতা যে নতুন ধারায় প্রবাহিত হয়, বর্তমান বাংলাদেশে তারই ধারা চালু হয়। তাই 'যবনী' ও 'বাঙালি' যে নামেই ডাকা হউক না কেন, ইসলাম সাম্য, মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের সুবিমল বারিধারা তাকে সঞ্জীবিত করে চলেছে। বলা বাহুল্য, যবনী শব্দটিও বাক্যরণগত ভাবে অশুদ্ধ। বাঙালী কবি দ্বিজ রামাঞির 'আগমন পূরাণ' তথা শূন্যপুরাণ কাব্যে তারই আগমণী গান রচিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইসলামী তৌহীদী চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে সীমাহীন অজ্ঞতার কারণে। তিনি এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে এক নয়া দৃষ্টিকোণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যার মূলে সর্বজনীন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ফলে তিনি বলতে পেরেছেন।

"ব্রহ্ম হৈল্যা মহামদ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল্যা শূলপানি।
গণেশ হৈল্যা গাজি কার্ত্তিক হৈল্যা কাজি
ফকির হইলা যত মুনি॥

এই ধারণা ভ্রান্ত ও শিশুসুলভ ও তৌহীদ বিরোধী। কিন্তু একটি কথা তিনি যথার্থই বলেছেন-

"ধর্ম হৈল্যা জবন রুপি মাথা এত কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হত্র ত্রিভুবনে লাগে ভত্র
খোদায় বলিয়া এক নাম॥"

বলা বাহুল্য, এই জবন/ "যবন রূপি' ধর্ম ঠাকুর কখনও এক আল্লাহ/ খোদা বা মুহম্মদের (পয়গম্বরের) প্রতীক হতে পারেন না। ইসলামের মানবতার বিকল্প নেই। তার 'যবন' ধর্ম ও যবাবতারের ধারণাও বিভ্রান্তিকর। ইসলামে অবতারবাদের কোন স্থান নেই। তৌহীদ/ নিরাকার সার্বভৌম এক আল্লাহর বিশ্বাসই তার মর্ম কথা।

এই আল্লাহ বিশ্বাসেরও কোন বিকল্প নেই।

তুং "এক দেব নিরঞ্জন
যার সৃষ্টি ত্রিভুবন
পরম পুরুষ সনাতন।"
(-কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী)

মুসলিম কবি এখানে আল্লাহ ব্যবহার করেছেন। বলা বাহুল্য, 'যবন' নামেও কোন ধর্ম নেই। এবং কস্মিন কালেও ছিল না। বাঙালীও না। যবন শব্দটিও এখানে

নতুন দেখা যাচ্ছে। যবন শব্দটি গ্রীক (>ইউপানী)। সম্ভবতঃ ইতিপূর্বে গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ কাল থেকে এই শব্দটি বহিরাগত আক্রমণকারীর প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। পরে মুসলমান আক্রমণের প্রেক্ষিতে তাদের যবন বলা হয়েছে। শব্দটি ব্যঙ্গাত্মক/ তির্যক।

কিন্তু ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে মুহম্মদ বিন বখ্‌ত ইয়ারের গৌড় বিজয়ের পরে শব্দটি বিজয়ী জাতির উপর আরোপ করা হয়েছে, যা যথার্থ নয়। বাংলা ভাষার আদি কবি দ্বিজ রামাঞির শূন্য পুরাণের সাক্ষ্যেই বলা যায়, কবি রামাঞি তাঁকে আক্রমণকারী হিসেবে নয়- দেশ বিজয়ীও নয় শুধু, দেশের প্রকৃত মুক্তিদাতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (ধর্ম মহারাজা)। তাই যবন নামে নতুন অভ্যুদিত এই জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রতিবাদে উনিশ শতকের কবি জামাল উদ্দীনের নিম্নলিখিত উক্তি স্মরণযোগ্য-

"জবন পবিত্র কুল বিধি বেদে বলে।
অকুলে পাইছে কুল জবনের কুলে ॥"

বেদ অর্থ এখানে চতুবেদ মনে করা হয়েছে ইত্যাদি। ইদানিং নব অভ্যুদিত বাংলাদেশকে অবশ্য 'যবন' নয় বাঙালী জাতি বলে সম্বোধন করা হচ্ছে। যার নাম রাখা হয়েছে বাংলাদেশ, এ কথা স্মরণে রাখা দরকার। আর যবন শব্দটিই বহিরাগত কৃত ঋণ (Borrowed) তাই অবশ্য বর্জনীয়।

এখানে আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, দেশ, মাটি, স্বর্গ দিয়ে জাতি গড়া যায় না, জাতি গড়ে ওঠে মাটি ও মানুষের সমন্বয়ে মানবতা নামক সম্পর্কের মাধ্যমে এবং পুতুল-প্রতিমা দিয়ে মানুষের বিকল্প খাঁড়া করা যায় না। মাটি মায়ের সন্তানদের জেনে রাখা উচিত- মাটির পুতুল কখনও মানুষের সমকক্ষ হতে পারে না। মাটি কারও মা এমনকি উপাস্যও হতে পারে না।

অধুনা বাংলাদেশ বাঙালী জাতি ও ধর্ম বলতে যদি কেউ জবন/যবন ধর্ম বলতে চান তবে তা ভুল হবে। কারণ, 'যবন' নাম জগতে ইসলাম বলে পরিচিত হয়ে আজ পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাই যবন বা বাঙালী জাতি আসলে হবে ইসলাম ভাবাপন্ন এক নবীন জাতি। প্রথম গৌড় বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি বখ্‌ত ইয়ার খালজীই শূন্য পুরাণে জবন নামে পরিচিত হয়েছিলেন। যবনাচার্যে, জবনযোগী যার ভ্রান্ত নাম। প্রকৃত নাম হওয়া উচিত বাংলাদেশী। বলা বাহুল্য, পশ্চিম বাংলা নামে যদি আলাদা রাষ্ট্রসত্তা (ভারত-বাংলা) নাম না থাকত তবে বাঙালী নামে জাতির অস্তিত্ব হয়ত কল্পনা করা যেত।

চতুর্থ খন্ড

# মানব জাতির সপক্ষে

প্রথম প্রকাশ ১৯৯২

॥ এক ॥

# মানব জাতির সপক্ষে

দুনিয়ার সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনের একটি উক্তি-

"ওয়া ইন্না হাযিহি উম্মতাকুম উম্মাতান ওয়াহিদাতান ওয়া আনা রাব্বাকুম ফাত্তাকুন"

মানে, নিশ্চয়ই মানব জাতি এক ও অভিন্ন এবং আমি (আল্লাহ) তোমাদের সকলেরই একমাত্র রব/ স্রষ্টা ও প্রভু ব্যতীত নই।

কথাগুলো কোনো বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায় সম্পর্কে নয়, সকল মানব-সমাজকে লক্ষ্য করেই বলা।

দুনিয়ার সকল মানুষই এক আদি পিতা-মাতার বংশধর এবং তাদের সকলেরই স্রষ্টা ও প্রভু একমাত্র আল্লাহতায়ালা। এ-কথা আজ আর নতুন করে বলার নয়।

এখন প্রশ্ন হল, জগতের স্রষ্টা যে একমাত্র আল্লাহতায়ালা, তা বুঝতে কষ্ট হয় না, কিন্তু কে সেই আদি পিতা-মাতা?

পবিত্র আল কুরআনের একটি বাণী উদ্ধৃত করা গেছে, এবার বাঙালী কবির একটি কবিতার চরণ উদ্ধৃত করা যাক-

"জগত জুড়িয়া এক জাতি আছে,
সে জাতির নাম মানুষ জাতি,
একই পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি-শশী মোদের সাথী।
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সকলে আমরা সমান যুঝি
কচি-কাঁচাগুলি ডাটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান বুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো
জলে ডুবি বাঁচি পাইলে ডাঙ্গা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারই সমানরাঙ্গা"

(জাতির পাঁতি/ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

আশা করি, এ ব্যাপারে আমাদের কোনো আপত্তির কারণ নেই। কবি ঠিকই বলেছেন।

তাহলে আমাদের মনোমালিন্য কোথায়?

কবি নজরুল ইসলামও লিখেছেন-

"আদম নূহ ইব্রাহীম দায়ূদ
সোলায়মান মুসা আর ঈসা,
সাক্ষ্য ছিল আমার নবীর
তাদের কালাম হল রদ।
সৈয়দে মক্কী মাদানী
আমার নবী মুহম্মদ।"

এখানে আল কুরআন বর্ণিত আটজন বিখ্যাত নবীর আগমন কাহিনী বলা হয়েছে।

নবী কে? কুরআনে নবী বললে আল্লাহ প্রেরিত যুগে যুগে যুগমানব, হিন্দু ভাষায় যাকে অবতার বলা হয়, বুঝায়। এঁরা কোনো বিশেষ যুগের বা বিশেষ মানব জাতির জন্য আসেন না, আসেন সকল কালের, সকল মানুষর পথ-প্রদর্শক নবী-রসূল পয়গম্বর/ অবতার রূপে। বলাবাহুল্য, নামগুলি বিভিন্ন ভাষা বা ধর্মগ্রন্থের হলেও মূল অর্থ একই। তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্যও এক। তাঁদের প্রচারিত বাণীও এক ও অভিন্ন। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, মানুষ তাঁদের আগমন ও উদ্দেশ্য নিয়ে তুলকালাম কান্ড বাধিয়ে তুলেছে। ব্যক্তিগত মনগড়া শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। সুফী কবি ফকীর লালন শাহ তাই যথার্থই প্রশ্ন তুলেছেন-

"কি কালাম পাঠাইলেন
আমার সাঁই দয়াময়
এক এক দেশে এক এক বাণী
কোন খোদা পাঠায়।
এক যুগে যা পাঠায় কালাম
আর যুগে তা হয় কেন হারাম
দেশে দেশে এমনি তামাম
ভিন্ন দেখা যায়।
যদি একই খোদার হয় বর্ণনা
তাতে তো ভিন্ন থাকে না

মানুষের সব রচনা
তাইতো ভিন্ন হয়
এক এক যুগে এক এক বাণী
পাঠান কি সাঁই গুণমণি
মানুরে রচনা জানি
লালন ফকীর কয়"।

এ প্রশ্ন সকল মানুষেরই। 'কালাম' মানে, 'বাণী' (সং), আল্লাহ বাণী-'কালিমাহ' (আঃ)।

সৃষ্টিকর্তা খোদাতায়ালা, লালন যাকে 'সাঁই গুণমণি' বলেছেন, যদি একই হয়, তা হলে তাঁর বাণী তো এক এক দেশে এক এক যুগে এক এক রকমের হতে পারে না। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তো তাই-ই ভাবছে। কথাটি একটু খুলাসা করে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

তাঁর আসল নাম কি? ঈশ্বর, ভগবান, আল্লাহ-খুদা, God— জিহোবা, অহুর মাজদা; কেউ আবার রহস্য করে বলছেন-ব্রহ্ম/ব্রহ্মা, বলেছেন, বিষ্ণু/কৃষ্ণ, মহেশ্বর/ দেবাদিদেব শিব প্রভৃতি। কিন্তু এ সবের দ্বারা কিছু কি ভিন্ন বোঝা যায়? নাম যাই হোক, মূলে তো একই সৃষ্টিকর্তা বুঝায়। এদের মধ্যে আল্লাহ-খুদার নামই বোধ হয় সর্ব কনিষ্ঠ।

কারণ আল কুরআনই সর্বকনিষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ যাতে আল্লাহর নাম সর্ব প্রথম উচ্চারিত হয়েছে। জিহোবা-গড য়িহুদী-খ্রীস্ট্রান ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে মেলে। কিন্তু নামে কি আসে, যায়, যাকে ডাকি সেই বুঝলে হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ কথাটি সুন্দর করে বলেছেন-

"আমি কিন্তু ডেকেই বসি যেটাই মনে আসুক না,
যাকে ডাকি সেই তো বোঝে আর সকলে হাসুক না।"

তুং ফারসী কবি হাফিযের- 'বনামে আঁকে হেজ নামে না দরদ।' বলাবাহুল্য, মানুষের ভাষার দুর্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু যিনি ভাষার মালিক তাঁর ভাষাতে তো দুর্বলতা থাকার কথা নয়। তাই তাঁর ভাষাতেই বলা যাক।

"আল ইয়াওমু আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু
আলাইকুম নিমাতী ওয়া রাদীতু লাকুমুল ইসলামী দীনা।"
-আল কুরআন

মানে, (এতদিন পরে), আজ আমি তোমাদের জন্য আমার দীন/ ধর্মকে পূর্ণতা

দান করলাম, আমার নেমাত/অবদান তামাম করলাম এবং একমাত্র ইসলামকে /শান্তির ধর্মকে অনুমোদন দান করলাম। এটি কিন্তু সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থের কথা। এখানে ইসলাম ধর্মকে মানব জাতির জন্য একমাত্র ধর্ম বিধান বলা হয়েছে। কুরআনের বাণী 'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একমাত্র দীন/ধর্মই হল এই ইসলাম'। বলা বাহুল্য কুরআন সর্বশেষ গ্রন্থ হলেও কুরআনের ধর্ম ইসলাম সর্বপ্রথম, মানে আদি (সনাতন) ধর্ম হয়। কারণ, আদি পিতা আদম থেকেই এর সূত্রপাত। এটিও কুরআনের দাবি। পত্রি বাইবেল-কুরআনেও বলা হয়েছে, মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম থেকে একে একে হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূসা, হযরত দাউদ, সুলায়মান ঈসা (আঃ) হয়ে আখেরী নবী রসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত এসে ইসলাম ধর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

আল কুরআনে কথাটি আরও স্পষ্ট করে ঘোষণা করা হয়েছে "হে মুহম্মদ, তুমি বলে দাও, আমরা আল্লায় বিশ্বাস করি, আমাদের উপরে যা নাযিল হয়েছে, এবং বিশ্বাস করি হযরত ইব্রাহীম, ঈসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং অন্যান্য গোত্রের মধ্যে যা নাযিল হয়েছে, বিশ্বাস করি ঈসা ও মুসাকে যা দেওয়া হয়েছে এবং আরও বিশ্বাস করি, আল্লাহর কাছ থেকে অন্যান্য নবীকে যা দেওয়া হয়েছে, আর তাঁদের একজনের সঙ্গে আরেকজনের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনে। আমরা সকলেই মুসলমান।"

[সুরা বাকারাহ, আয়াত -১৩৩]

উল্লেখ্য, এখানে নবী অর্থে সকল জাতির ধর্মগুরু মনে করা হয়েছে। ইসলামে যাকে সাধারণভাবে নবী/রসূল বলা হয়েছে, তাঁদের কাউকে য়িহুদী, কাউকে খ্রীস্টান এবং কাউকে মুসলমান বলা হয়েছে।

কিন্তু আসলে কে হিন্দু, কে মুসলমান, আর কে য়িহুদী, কে খ্রীস্টান? 'এক আল্লাহ জগৎময়।'

এখানে মুসলমান বলতে পূর্ণ মানব জাতিকেই বুঝানো হয়েছে। মুসলমান একজন সত্যসন্ধ পূর্ণ মানুষের নাম। মুসলমান/ মুসলিম শব্দের মৌল অর্থ হল- সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নিবেদিত ব্যক্তিগণ।

তুং হাদিস শরীফের বাণী-

'আল মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমীনা বে-লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহী-।' মানে, মুসলিম ঐ ব্যক্তি, যার কথায় ও আচরণে অন্য মুসলমান/ মানুষ নিরাপদ থাকে।

কবি নজরুলের ভাষা-

"কেবল মুসলমানের লাগিয়া
আসেনিক ইস্‌লাম
সত্যে যে চায় আল্লায় মানে
মুসলিম তারি নাম।"

মানে, মানব জাতির একটি বিশেষ নাম মুসলিম।

কুরআনে আরও বলা হয়েছে, "তারা বলে, য়িহুদী-খ্রীস্টান না হলে, কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না। এটা হল তাদের শূন্যগর্ভ মনোভাব। বল, হে মুহম্মদ, যদি তোমারা সত্যবাদী হও, তবে তার প্রমাণ দাও, তাতো নয়,- বরং যে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎ কর্ম করে, তার প্রভুর কাছে সে পুরস্কার পাবে। এ রকম লোকের কোনো রকম ভয়ের বা দুঃখের কারণ নেই।"

[সুরা বাকারাহ। আয়াত ১১১-১১২]

আরও বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই যারা মুসলমান, আর যারা য়িহুদী, আর যারা খ্রীস্টান এবং যারা সাবেয়ীন (সূর্য ইত্যাদির উপাসক) এঁদের মধ্যে যারা আল্লাহ, ও পরকালে বিশ্বাস করে, আর সৎকাজ করে, তারা তাদের প্রভুর কাছ থেকে পাবে পুরস্কার। তাদের কোনো ভয়ের বা দুঃখের কারণ নেই।" [পূর্বোক্ত। আয়াত- ৬২]

য়িহুদী-খ্রীস্টান-মুসলমান এবং সাবেয়ীন, মানে অন্যান্য প্রকৃতিপূজক/সূর্য পূজক (হিন্দু) অগ্নিপূজক (পারসিক) ইত্যাদি জাতির কথাও বলা হয়েছে। তারা কোন্ জাতি বা সম্প্রদায়ের, এটি বড় কথা নয়, বড় কথা হল- তারা কত বড় মানুষ এবং তাদের স্রষ্টা ও সৃষ্টির আস্থাভাজন ও আত্মনিবেদিত। বর্তমান উদ্ধৃতির শেষ উক্তিতে আমরা মুসলমান/ নাহনু মুসলিমুন, কথাটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলি।

এই সঙ্গে আরও স্মরণযোগ্য, আল্লাহর বিচারে কেউই বঞ্চিত হবেন না, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই তাদের কৃতকর্মের জন্য পুরস্কার পাবেন বা তিরস্কার পাবেন। কেউ মাহরুম/ বঞ্চিত হবেন না।

এবার সমগ্র মানব জাতির নিরিখে বিষয়টির বিচার করা যাক।

আগেই আদি পিতা-মাতা আদম-হাওয়ার কথা বলা হয়েছে, আল কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী- আদম হাওয়াই মানব জাতির আদি পিতা-মাতা।

আল্লাহ বলেছেন, -"হে আদম জাতি, নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক প্রভু এক, আর নিশ্চয়ই তোমার পিতা এক। তোমরা সকলেই আদমের সন্তান, এবং আদম

মাটি থেকে সৃষ্টি। নিশ্চিয়ই তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যে সকলের চেয়ে অধিক ধর্মপরায়ণ/ আতকাকুম।"

[আল হাদিস (কুদসী) বিদায় হজ্জের রসুল-বাণী]

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে আদি-পিতা/আদম হাওয়াকে নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে। সবচেয়ে কৌতুহল জনক বিবৃতি মিলছে বাংলা সাহিত্যের এক প্রাচীন কবি রামাঞি পন্ডিতের 'শূন্যপুরাণ নামক কাব্যে।

যেমন,

"ব্রহ্ম হৈল্যা মহামদ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম হৈল্যা শূল পাণি।
গণেশ হৈল্যা গাজী কার্তিক হৈল্যা কাজী
ফকির হৈল্যা যত মুনি॥"

এ ছাড়া-

"আপুনি চন্ডিকা দেবী তিহ হৈল্যা হায়া বিবি
পদ্যাবতী হৈল্যা বিবি নূর।

এখানে আদি পিতা ব্রহ্মাকে 'মহামদ' (মুহম্মদ?) বলা হয়েছে, এবং চন্ডিকা-তনয় কার্তিককে মুসলিম বিশ্বাসের 'কাজী' এবং গণেশকে বলা হয়েছে 'গাজী'। পুরন্দর/ দেবরাজ ইন্দ্রকে একস্থানে বলা হয়েছে 'মওলানা'। সম্মানিত মহাপুরুষ।

স্পষ্ট বুঝা যায়, বঙ্গবিজয়ী প্রথম মুসলিম সেনপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খালজীকে (৬০০ হিঃ /১২০৩ খ্রী) সমকালীন বাঙালী মুসলমান সমাজের আপন আত্মীয়-পরিজন বলে বরণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ যখন এক এবং মানব-জাতিও এক আদম-হাওয়ার বংশধর তখন হিন্দু মুসলমানে ভেদাভেদ কিসের? দেবতারা তাই দলে দলে 'ইজার' পরতে লাগলেন। কথাটি পন্ডিত কবি যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন মনে হয়; তবে ইসলামী তৌহীদ ও আল কুরআনের মূল দর্শন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় তিনি বিষয়টি ঘুলিয়ে ফেলেছেন। নইলে তিনি আদি পিতা-মাতা হিসেবে (আদম-হাওয়া/ হাওয়াকে) হিন্দু বিশ্বাসের শিব-চন্ডী বলে উল্লেখ করে, ব্রহ্মাকে মহামদ/ মুহম্মদ ও বিষ্ণুকে পয়গম্বর/ পেকাম্বর বলতে পারতেন না।

হিন্দু-বিশ্বাসে অবতার হলেন স্বয়ং ভগবান বা ভগবানের অংশীদার হিসেবে স্বীকৃত। পক্ষান্তরে মুসলমানগণ তাদেরকে মানুষের অতিরিক্ত মর্যাদা দিতে নারায।

তাঁদের মতে, মানুষ আশরাফুল মখলুকাত'/সৃষ্টির সেরা বটে, তবে স্বয়ং খুদা বা খোদার অংশাবতার নন। হতে পারেন না। তা ছাড়া ইসলামে নবী-রসূলগণ পৃথিবীতে আল্লাহর বিশেষ মানব-দূত হিসেবে (মানব-জাতির পথ- প্রদর্শক) আসেন।

তুলনীয় বাঙালী কবি চন্ডীদাসের একটি বিখ্যাত উক্তি-

'সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

কথাটি একজন ইসলাম-বিশ্বাসীর মতে হবে-

'সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে সাঁই।'

মানে, সর্বশক্তিমান খুদাতায়ালার উপরে কারও স্থান (মানব-দানব-দরেন্দা-পরেন্দা) নেই। কারণ, ইসলাম-বিশ্বাসীর মতে, স্রষ্টা/ আল্লাহ সর্বশক্তিমান তো বটেই, তিনি সর্বত্র বিরাজমানও/কুল্লি সাইইন কাদির ওয়া কুল্লি সাইয়িম মুহীত'। -আল কুরআন

এই দৃষ্টিকোণে বিচার করলে মানব-জাতির ক্রম দাঁড়ায়-

মানব-জাতির আদি পিতা-মাতা

১। আদম-হাওয়া শিবদুর্গা

২। ইব্রাহীম ব্রহ্মা;

৩। বিষ্ণু কৃষ্ণ। কাহেন।

এঁরা মানুষ মাত্র, দেবতা নন।

উল্লিখিত কাজী-গাজী কোনো ব্যক্তিগত নাম নয়- উপাধি

কাজী (আঃ) অর্থ -বিচারক
গাজী (আঃ) - ধর্মযোদ্ধা
মাওলানা (আঃ) আমাদের প্রভু
(ইসলামী ধর্মবেত্তা)।

এছাড়া বিষ্ণু-যিনি চির প্রকাশবান, পালন কর্তা, ব্রহ্মা ও সৃষ্টকর্তা।

---- শিবনন্দিনী পদ্যাবতীর (পদ্মাবতী) সঙ্গে যে বিবি নূর (নূর)-এর তুলনা দেওয়া হয়েছে, তারও কোনো ভিত্তি নেই। হিন্দু পুরাণে পদ্মাবতীর যে জন্ম কাহিনী

আছে, তা নিতান্তই উদ্ভট ও কল্পকাহিনী মাত্র। পক্ষান্তরে বিবি নূর যদি শেষ নবী-নন্দিনী হযতর ফাতিমার/ ফাতিমাতুজ জোহরা ইশারা করা হয়ে থাকে, তাও নিতান্তই কল্পনার।

মনে হয়, এই উদ্ভট ধারণার বশীভূত হয়ে পরবর্তীকালে লোক-কাহিনীর (Folklore) 'কালী মা' ও আলী-ফাতিমার জন্ম হয়েছিল।

তুলনীয় লোকমন্ত্র-

'কালীঘাটে কালী মা
হায় আলী, হায় ফাতিমা'।

বলাবাহুল্য, এই তুলনা বিভ্রান্তিকর। মানুষ ও সৃষ্টিকর্তার তুলনা হয় না। এবার ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এর আলোচনা করা যেতে পারে।

কুরআন- বাইবেলের বর্ণনা মতে, মানব জাতির উদ্ভব ও বিকাশের ধারা এইরূপ-

| | | |
|---|---|---|
| ১। | হযরত আদম (আঃ)- | মানব জাতির আদি পিতা; |
| ২। | হযরত নূহ (আঃ) | দ্বিতীয় আদি পিতা; |
| ৩। | হযরত ইব্রাহীম (আঃ)- | তৃতীয় আদি পিতা; |
| ৪। | মূসা (আঃ)- | গোত্রের প্রধান, য়িহুদী জাতির |
| ৫। | দাউদ (আঃ) | য়িহুদী জাতির আদি পিতা |
| ৬। | সুলায়মান (আঃ) | (King Solomon) |
| ৭। | ঈসা (আঃ) | খ্রীস্টান জাতির স্রষ্টা, নবী। |
| ৮। | মুহম্মদ (সঃ)- | মুসলিম জাতির শেষ নবী |

সাম্প্রতিক গবেষণার আলোকে এঁদের মধ্যে হযরত নূহ হলেন বাইবেল মতে 'নোয়া', কুরআন মতে, নূহ এবং হিন্দু পুরাণ মতে, মনু। হযরত ইব্রাহীম হলেন ব্রহ্মা। মুসা, দাউদ, সুলায়মান হলেন য়িহুদী ধর্মের এবং হযরত ঈসা খ্রীস্টান। ধর্মের সুপরিচিত নবী/ রসূল। সকলের নবী মুহম্মদ (রসুলুল্লাহ)।

এবার একটু বিস্তারিত আলোকপাত করা যাচ্ছে।

আধুনিক গবেষকগণ মানব-জাতির উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছেন। আমাদের আলোচনা মূলতঃ তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র/ Comparative Religion/ Theology. লোকবিদ্যা/ Folklore ও তুলনামূলক

ভাষাতাত্ত্বিক/ (Comparative) দৃষ্টিকোণ দিয়ে করা যাচ্ছে।

শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ দিয়ে আদি পিতা হযরত আদমের কাল নির্ণীত হয়েছে মোটামুটি খ্রীস্টপূর্ব ৬০০০ বছর থেকে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) বছর।

'তাই আদম থেকে মানব-জাতির ক্রম দাঁড়ায়-

(১) হযরত আদম খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর

(২) হযলত নূহ খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১০৫৬ বৎসর

(৩) হযরত ইব্রাহীম খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৭০০ বৎসর;

(৪) হযরত মূসা খ্রীঃ পূঃ ১৩০০;

(৫) হযরত দাউদ খ্রীঃ পূঃ ১০০০;

(৬) হযরত সোলায়মান খ্রীঃ পূঃ ৯০০;

(৭) হযরত ঈসা খ্রীঃ ১-৩৩ খ্রীঃ ;

(৮) হযরত মুহম্মদ (সঃ) ৫৭০-৬৩২ খ্রীঃ ;

হিন্দু মতে, হযরত নূহকে মনু (আদি পিতা) বলা হয়েছে। মনু থেকে মানব-জাতির উদ্ভবও বলা হয়েছে (মনু>মানব)। য়িহুদী-খ্রীস্টান-মুসলমান মতেও নূহকে 'দ্বিতীয় আদম' বলা হয়েছে। মানে, তাঁর কালে যে মহাপ্লাবণ হয়, অনুমিত হয়, তাতে পৃথিবীর জীবজন্তু ইত্যাদি এমনভাবে বিপর্যস্ত হয় যে, তার চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকে না। তবে হযরত নূহ আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক জাহাজ তৈরি করে সৃষ্টি জগতের যে সামান্য নমুনা উদ্ধার করতে সমর্থ হন, তা থেকে নতুন সৃষ্টি-জগতের পত্তন হয়। এই হিসেবে তাঁকে মানব জাতির আদি-পিতা বলা হয়। হিন্দু পুরাণেও মনুর কালের মহা-প্লাবনের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাইবেল- কুরআনে তার বিস্তারিত পরিচয় মেলে। এই মহা-প্লাবনকে বাইবেলে বলা হয়েছে 'Deluge' / তুফান। কৌতুহলের ব্যাপার, সাম্প্রতিককালে কুরআন-বাইবেল বর্ণিত তথ্যের আলোকে জুদীপর্বত/ আরারাত পর্বতমালার শীর্ষ থেকে এই তথাকথিত নূহের জাহাজের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারকৃত হয়েছে। স্থানটি বর্তমানে আর্মেনিয়া দেশের অন্তর্গত। অনুমিত হয়েছে, হযরত নূহের বংশধর ও উত্তর পুরুষগণ এই এলাকা থেকেই পরবর্তীকালে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান বিশ্বে এই নূহের বংশধরগণই বসবাস করছে। বর্তমান ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিসমূহ ও ভাষা-গোষ্ঠীসমূহ এই নূহেরই উত্তরাধিকারী।

যেমন -হাম, সাম, ইয়াপেচ/ যেফত। এঁরা হযরত নূহের তিন পুত্র। এদেরই

নামান্তর আর্যজাতি। বর্তমান ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হল-হিন্দুস্তানী আর্য, পারস্য/ ইরান/ ইরানীয় আর্য; চীন/ মঙ্গোলিয়া-মঙ্গোলীয় আর্য; হাবসী- আফ্রিকীয় জাতি ইত্যাদি। সংক্ষেপে এদেরকে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি বলা হয়।

এদের ভাষাকেও বলা হয়- উন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী (Indo European Languages)। সম্ভবত: কাসাসুল আম্বীয়া/ নবী-কাহিনীতে মঙ্গোলীয়দেরকে 'ইয়াজুজ-মাজুজ' বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, কুরআনে এদেরই আদি-পিতা হযরত ইব্রাহীম নামে পরিচিত (আবীকুম ইব্রাহীম)।

হযরত ইব্রাহীমের দুই পুত্র-ইসমাঈল ও ইসহাকের বংশধর- বনূ ইসমাঈল ও ইসরাঈল গোষ্ঠীতে এখন দুনিয়া ছেয়ে গেছে। উল্লেখ্য, জ্যেষ্ঠপুত্র ইসমাঈলের বংশে জগতের শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) আরব দেশের মক্কা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন (৫৭০ খ্রী-৬৩২ খ্রী) এবং বনূ ইসরাইল বংশ মধ্যপ্রাচ্যে বায়তুল মুকাদ্দিসকে কেন্দ্র করে ইসরাইল রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে। এদেরই আদি পিতা হযরত মুসা। মুসার পরে দাউদ-সুলায়মান প্রভৃতি।

আল কুরআনে ইব্রাহীম ও মূসার প্রতি 'সহীফা'/ কিতাব নাযিল করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ['ফি সুহ্‌ফে ইব্রাহীম ওয়া মূসা'] মূসার পরে তাঁরই বংশে দাউদকে 'সাম' কিতাব দেওয়া হয়েছে (Psalms of David)। নামান্তর যবূর কিতাব।

উল্লেখ্য, ভারতীয় দ্বিতীয় বেদের নামও 'সাম' অর্থ একই গান (Psalms)। তুং মুসলিম সূফীতাত্ত্বিক 'সামা গান'। উল্লেখ্য, দাউদের কিতাব 'যবুর' মূল খ্রীস্টীয় বাইবেল কিতাবের অন্তর্ভুক্ত (তৌরাত, যবুর ও ইঞ্জিল)। এগুলি একত্রে বাইবেল নামেই কথিত (Old and New Testament)।

শুধু মূসার কিতাব-'তৌরাত' দাউদের কিতাব 'যবুর' ও ঈসার কিতাব 'ইঞ্জিল' নামে কথিত। সম্ভবতঃ ইব্রাহীমের কিতাবই মূলগ্রন্থ 'বেদ' (ঋক, সাম, জজুঃ ও অর্থব) নামে কথিত। অথবা ইব্রাহীমসহ আরও কোনো নবী/ অবতার এর গ্রহীতা ছিলেন। তবে কি তাঁর যথাক্রমে-ব্রহ্মা/ইব্রাহীম, বিষ্ণু/কৃষ্ণ (আঃ কাহেন) ও মহেশ্বর/ আদম বা শিব ছিলেন?

'মনু সংহিতা' থেকে জানা যায়, মনুর উত্তরাধিকারীদের (ভারতীয় হিন্দুদের) মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে চারিটি বর্ণভেদমূলক জাতির উদ্ভব ঘটে। এরাই ভারতীয় হিন্দু জাতি নামে পরিচিত। কথিত হয়, এই হিন্দু জাতির আদি পিতা ব্রহ্ম/ব্রহ্মা থেকেই এই জাতি 'ব্রাহ্মণ্যবাদী' জাতি নামে চিহ্নিত হয়। কথিত

হয়, এই ব্রহ্মার মুখ-নিঃসৃত জাতিকে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, উরু থেকে নির্গত ক্ষত্রিয় জাতি, ক্ষাত্র শক্তিতে শ্রেষ্ঠ, এবং বৈশ্যগণ বাহু থেকে নির্গত হয় এবং বিষয়-কর্ম থেকে হিন্দু জাতির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিতে নিয়োজিত বলে তারাও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। সর্বশেষ জাতি শুদ্র ব্রহ্মার পদধূলি-জাত বলে সর্বনিকৃষ্ট ও নিগৃহীত পদ-দলিত বলে পরিচিত। মহর্ষি বাল্মিকী রচিত সংস্কৃত রামায়ণেও (রামের চরিত) শূদ্র জাতির প্রতি হিন্দু-সমাজের চরম অবহেলার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে (দেখুন- বাল্মিকী রামায়ণ, উত্তর কান্ড-'শম্বুক' শূদ্র বধ উপাখ্যান)।

ভারতীয় উপ-মহাদেশে এই জঘন্য প্রথা অদ্যাবধি অত্যন্ত জাগরিত। সম্ভবত: জগতের ইতিহাসে এমন নির্মম ও অমানবিক প্রথা অন্য কোনো দেশেই প্রচলিত নেই। বাল্মিকী রামায়নে শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণ-জাতির নিগ্রহকে নিতান্ত ভবিতব্য বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু কি তাই? বেদ ভারতীয় হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে কথিত হলেও এই তথাকথিত শুদ্র জাতির তা পাঠ তো দূরের কথা, স্পর্শ করাকেও মৃত্যুদন্ড যোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হত। স্বয়ং রামচন্দ্র, যাকে ভগবানের অবতার বা স্বয়ং ভগবান বলে মনে করা হত, তিনি মন্ত্র পাঠরত শম্বুক শূদ্রকে স্বহস্তে বধ করে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের মর্যাদা রক্ষা করে গৌরববোধও করেছিলেন। আরও উল্লেখ্য, হিন্দু পুরাণে রামের মাহাত্ম সম্পর্কে কথিত আছে যে, তাঁর সংস্পর্শে এলে অতি বড় মহাপাপীও পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য শুদ্র-জাতির যে, শম্বুক রামকর্তৃক নিহত হলেও তাঁর পরিত্রাণের কোনো উপায় হবে না বলেও রামায়ণে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই কি হিন্দু পন্ডিতেরা (মাতৃভাষায়) রামায়ণ-মহাভারত গ্রন্থ রচনাতেও আপত্তি জানিয়ে ছিলেন।?

তুং "অষ্টাদশ পুরানানী রামস্য চরিতানিচ।
ভাষায়াং মানবশ্রুতাং রৌরবং নরকং ব্রজেতা।"

মানে, আঠারো পুরান (মহাভারত) ও রামের চরিত
রামায়ণ মাতৃভাষা (বাংলায়) শুনলেও তার জন্য
রৌরব নরক গমন সুনিশ্চিত।

এরই পাশে পাই, আল কুরআনের ব্যবস্থা-
"অমা আর্সলনা মির্রসূলীন ইল্লা বি লিসানি কাওমিহি।"
আমি সকল নবী/ অবতারকেই মাতৃভাষায় প্রচারার্থে পাঠিয়েছি।

ষোলো শতকের বাঙালী কবি সৈয়দ সুলতানকেও তাই বলতে শুনি-
"আল্লায় বুলিছে মুঞি যে দেশে যে ভাষ।

সে দেশে সে ভাষে কৈলুঁ রছুল প্রকাশ॥
কে ভাষে পয়গম্বর এক ভাষে নর।
বুঝিতে ণ পারিব উত্তর-পদুত্তর ॥
[নবীবংশ। সৈয়দ সুলতান]

শুধু ভাষা সম্পর্কেই নয়, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকারের বাণীও সম্ভবত: আল কুরআনেই সর্ব প্রথম ঘোষিত হয়েছে।

মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই, ভাষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও কোনো তফাৎ আল কুরআন স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে, ভারতীয় শূদ্র জাতির প্রতি ব্রাহ্মণ্য সমাজের আচরণ আদি কাল থেকেই চলে আসছে। বাল্মিকী-রামায়ণ থেকেও জানা যায়, শূদ্রদের প্রতি এই ব্যবস্থা সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ অবধি বলবৎ থাকবে। সম্ভবত: শম্বুকের বিদ্রোহ ছিল এই ব্রাহ্মণ্যবাদী শাস্ত্র শাসনের বিরুদ্ধে। রামচন্দ্রের এক প্রশ্নের জবাবে শম্বুক তাই বলে, তাঁর এই শাস্ত্র বিরুদ্ধ যোগসাধনার মূল উদ্দেশ্য হলো দেবত্ব অর্জন এবং তারপর দেবলোক বিজয় করে শুদ্রের অধিকার প্রতিষ্ঠা। শুদ্র জাতির এ বিদ্রোহ জগতের ইতিহাসে স্মরণীয়। রামচন্দ্রের পক্ষে তাই শম্বুকের উপর ক্রোধ জাগা স্বাভাবিক, কিন্তু স্বাধিকার হারা শূদ্রের এ অভিযান রোধ করা সহজ সাধ্য নয়। মনে হয়, পরবর্তী সামবেদে তাই আংশিকভাবে শূদ্রের অধিকার প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু শূদ্রেরা তাতে সন্তুষ্ট ছিল না। এখানে মনে রাখতে হবে, বাল্মিকী ঋষি ছিলেন, দেবতা ছিলেন না (দেবর্ষি)। তাই দেখা যায়, গৌতম বুদ্ধের বৌদ্ধ ধর্মে শূদ্রের অধিকার স্বীকৃত হলে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ পুনরায় ক্রুদ্ধ হয়েছিল। কুমারিল ভট্ট ও শংকরাচার্যের অভিযান ছিল তারই বিরুদ্ধে। সারা ভারতব্যাপী বুদ্ধ-সেবকগণ নির্যাতিত হয়েছিলেন। বিশ্ব-ইতিহাসে তা সুবিদিত। সামবেদে শূদ্রের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে দেখা যায়, পরবর্তী অর্থব বেদে, মানে, কলিযুগের শুরুতে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি কল্কী অবতারের আবির্ভাব কাল। যথাস্থানে সে আলোচনা করা যাচ্ছে।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সনাতন যুগে ব্রহ্মা, ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে। এবং সম্ভবত: কলিতে বুদ্ধ ও কল্কীর আবির্ভাব ঘটে। বর্তমানে কলিযুগ চলছে। এই চার যুগে দশজন অবতারের আগমণ হয়, যথা,

"মৎস কুর্মো বরাহশ্চ নরসিংহোহত বামনা ঃ
রামো রামশ্চ রামশ্চঃ বুদ্ধঃ কল্কি চ ॥"

উল্লেখ্য, কল্কী পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ অবতারের নাম নেই। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত রাজধানী দ্বারকা নগরীর ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার করেছেন ভারতীয় সাগর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ (ডঃ এস, আর, রাও-এর প্রতিবেদন, ভারত-বিচিত্রা। মার্চ, ১৯৮৮)।

অন্যত্র বলা হয়েছে, সামবেদের বীজমন্ত্র রূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তার নামের আদ্যাক্ষর যুক্ত মন্ত্র সন্নিবেশিত হয়েছে (ওঁ)। এই মন্ত্র শূদ্রদেরও জপ্য।

কিন্তু আসল মন্ত্র কোনটি? ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতে শূদ্ররাই বা এ অধিকার কবে থেকে পেলো? প্রশ্ন হতে পারে। আশুতোষ দেবের "ছাত্রবোধ বাংলা অভিধানে' বীজমন্ত্ররূপে যথাক্রমে 'ওঁ' ও ঔঁ' কার নামে দুটি সাংকেতিক বর্ণের উল্লেখ আছে।

প্রথমটির অর্থ বলা হয়েছে (১) 'ঈশ্বরের গূঢ় নাম ওঁ কার। সামবেদের অংশ বিশেষ'। (কলিকাতা, ১৯৬৯। পৃঃ ৩৩৭) (২) 'ঔঁ কার- শূদ্রজাতির সেব্য সামবেদের অংশ বিশেষ' (পৃঃ ৮৪৭)। সামবেদের পরে অথর্ব কলিযুগের বেদ বলেই মনে হয়। অথচ আমরা জানি, বেদ আদৌ শূদ্র জাতির সেব্য নয়। পক্ষান্তরে, বেদ বাণী তাদের কানে গেলেও তাদের মৃত্যুদন্ড বিধান আছে। বাল্মিকী রামায়ণেও তার বিশেষ সমর্থন মিলছে। তবে কি শূদ্র জাতির সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ফলে পরবর্তীকালে এ অধিকার স্বীকৃত হয়েছে?

বাল্মিকী-রামায়ণে বলা হয়েছে, কলিযুগে জাতিধর্ম নির্বিশেষে শাস্ত্র চর্চায় সকলেরই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে তার আগে নয়।

কৌতূহলের ব্যাপার, সামবেদে আখেরী নবী রসুলুল্লাহ্‌র আগমন কথাও ঘোষিত হয়েছে। যেমন-

"মদৌ বর্তিতা দকারন্তে প্রকীর্তিতা।
বৃষমাংসভক্ষয়েত সদা বেদশাস্ত্রে চ-স্মৃতা।"

মানে, যার প্রথম অক্ষর 'ম' এবং শেষ অক্ষর 'দ'; যে দেব সর্বদা গোমাংস ভক্ষণ করেন, বেদ শাস্ত্রে তার গুণ বর্ণিত আছে। তার অনুসরণ করবে। বলতে বাধা নেই, এখানে দেব অর্থে মানুষ দেবতার কথা বলা হয়েছে। কারণ, মুসলিম শাস্ত্রে দেব-দেবীর কোনো প্রসঙ্গ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদের অন্যত্র (কঠ উপনিষদেও) শেষ নবীর শানে বলা হয়েছে-

"আসীনো দূরং ব্রজতি স্বয়নো যাতি সর্বত্র।
কস্তং মদামদং দেবস মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি।"

অর্থাৎ যিনি আসীন অবস্থায় সর্বত্র যান সেই মদামদ দেবকে আমা (যম) অপেক্ষা কে জানতে সমর্থ? বলছেন স্বয়ং যম (ভগবান)। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অনুমান করেছেন, এটি মদামদ/ মুহম্মদ নবীর মেরাজ গমনের উল্লেখ ভিন্ন কিছু নয়। সম্প্রতি প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের রিসার্চ স্কলার ডঃ বেদ-প্রকাশ উপাধ্যায় এম-এ (সংস্কৃত বেদ) মহাশয় সংস্কৃত বেদ-পুরাণ থেকে এর সপক্ষে বেশ কিছু তথ্য উদ্ধার করে তা প্রকাশ করেছেন [বেদ ও পুরাণে হজরত মোহাম্মদ। ১ম সং, ১৯৭৮] তিনি হিন্দু ধর্মকেই বিশ্বধর্ম বলেছেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আরও বলেছেন, কঠ-উপনিষদে যে 'মদামদ' দেবের উল্লেখ আছে, সম্ভবত: তৌরাতে তাঁরই নাম 'মেউদ মেউদ' ও অন্যত্র 'প্যারাক্লিট'/ শান্তিকর্তা বলা হয়েছে। প্যারাক্লিট গ্রীক শব্দ প্যারাক্লিটস থেকে ব্যুৎপন্ন [নবী করীম হযরত মুহম্মদ (দঃ)। শহীদুল্লাহ, পৃঃ ৭৮)। ত্রিপিটকেও 'মেত্তেয়'/ মৈত্রেয় বুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। বলা প্রয়োজন, 'বুদ্ধ' মানেও আরবীতে নবী/ পয়গম্বর বুঝায়। শেষ নবী রসূলুল্লাহর একটি উপাধি ছিল রাহমাতুল্লিল আলামীন/ মৈত্রেয় [প্রসঙ্গক্রমে এখানে গীতায় উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভগবানত্ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলাপ করা যায়।

হযরত আবু হোরায়রার বর্ণনা থেকে জানা যায়-

প্রাচীনকালে 'কাহেন'/কৃষ্ণ (?) নামে একজন ভাববাদী ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের মান্য 'শ্রীমদ্ভাগত গীতা'য় শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান (কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং) বলে কথিত হয়েছে। এই হিসেবে শ্রীকৃষ্ণের বাণীকে শ্রী ভগবানের বাণী বলেই গৃহীত হয়েছে। ব্রহ্ম/ব্রহ্মা সম্পর্কেও এরূপ উক্তি আছে।

কিন্তু বহু ভাষাবিদ পন্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রাচীন বেদবাণী উদ্ধার করে প্রমাণিত করেছেন যে, আধুনিক গীতা শ্রীভগবানের বাণী হতে দোষ নেই, তবে গীতা কথিত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান নন- এই উক্তি প্রাচীন গীতায় ছিল না। পরবর্তীতে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান প্রতিপন্ন করার প্রয়াসে এই উক্তি যোগ করা হয়েছে। খ্রীস্টীয় দশম শতকে অভিনব গুপ্ত সম্পাদিত গীতায় এই বাণী অনুপস্থিত বলে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দাবি করেছেন।

[শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ। সফীউল্লাহ স। ১৯৮৭।

তিনি জানিয়েছেন মূল গীতায় যুগে যুগে অবতার আগমনের কাহিনী সত্য, তবে সে অবতার স্বয়ং ভগবান নন, বরং তাঁর প্রেরিত পুরুষ, যাকে ইসলাম মতে, নবী/রসূল, য়িহুদী-খ্রীষ্টান মতে, Prophet' বলা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে (বেদ-বাইবেলের) এই বাণী যুগে যুগে বিকৃত হয়েছে। এর ফলে হিন্দু ধর্মে প্রচারিত অবতারত্ব এবং খ্রীস্টান-য়িহুদী ধর্মে প্রচারিত ত্রিত্ববাদ (Trinity) একই

শ্রেণীর মনে করা যায়। উল্লেখ্য, মূল বাইবেলে এই ত্রিত্ব/ত্রীশ্বর বাদেরও অস্তিত্ব নেই। তাই ত্রিত্ববাদী খ্রীস্টান মতের পরিবর্তে একত্ববাদী (Unitarinan) মতবাদ চালু হয়েছে। ত্রিত্ববাদ বলতে "খোদা, পিতা, খোদা, পুত্র এবং পবিত্রাত্মা (জিব্রাইল) God, the Father, God, the Son and the Holy Ghost (Ghabrail)] খোদা হয়ে উঠেছেন।

এভাবে 'একে তিন, তিনে এক' এই পৌত্তলিক মতবাদের জন্ম হয়েছে। পরবর্তী ধর্মগ্রন্থ কুরআনে তার তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। বস্তুত ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও অসাম্যের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছে।

এবার ঋগ্‌বেদ কথিত ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রসঙ্গে আসা যাক।

ব্রহ্মা কে/ ব্রহ্মা কি ভগবান স্বয়ং?

বেদে ব্রহ্মাকে আদি -দেবতা/ অগ্নি -দেব বলা হয়েছে।

ব্রহ্মা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এইরূপ-

ল্যাটিন ভাষায় ফ্লাম্ম / 'Flamma' শব্দ থেকে ব্রহ্ম শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে পাশ্চাত্য পন্ডিতদের ধারণা। 'flamma' থেকে 'flame'/আগুন শব্দের উৎপত্তি।

ভাষাতাত্ত্বিক দিক দিয়ে ব্রহ্মা, ফা, বারহামা ইং A-Braham, Abraham > আ ইব্রাহীম হওয়া স্বাভাবিক [ডক্টর হরেন্দ্র চন্দ্র পাল। The Epilogue p. 353] আল কুরআনে হযরত ইব্রাহীমকেও আদি-পিতা বলা হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত আছে, রাজা নমরুদের (যিনি নিজেকে খোদা বলে দাবি করতেন) নির্দেশে ইব্রাহীমকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়; কিন্তু দৈব উপায়ে তিনি অগ্নিকুন্ড থেকে মুক্তি পান [আল-কুরআন ঃ ২১ঃ ৬৯।]

তাই কি দেব-দ্বিজে ভক্তিমান সম্প্রদায় তাঁকে অগ্নি-দেবতা/ অগ্নিকুন্ড বিজয়ী, এবং তা থেকে স্বয়ং অগ্নিদেবতা রূপে পূজা দিতে শুরু করেন? এভাবে অগ্নি-পূজা, সূর্য-পূজা ইত্যাদির প্রচলন হয় কালে কালে? হিন্দু ধর্মের বীজ মন্ত্র-'গায়ত্রী' তো আসলে সূর্য পূজা।

ভারতীয় হিন্দুগণ/ আর্যগণ ব্রহ্মা তথা অগ্নি-দেবতার পূজারী, এদেরই অন্যতম শাখা পারস্য দেশীয় (আর্যগণ) পারসিক সম্প্রদায় অগ্নিপূজক হিসেবে পরিচিত (মজুসী ধর্ম)। উল্লেখ্য পারস্য দেশে অগ্নিপূজার প্রচারক যরথুস্ত্র/ যরদৃশ্‌ত-এর আবির্ভাব কাল খ্রীস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ ধরলে দেখা যায়, তিনি ভারতীয় ব্রহ্মবাদী

(ব্রাহ্মণ্য)। সম্প্রদায়ের উত্তর-সূরী ছিলেন। সকলের শেষে আসেন ইসলামের নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)। অবশ্য ইসলাম কোন নতুন ধর্ম নয়, এটি আদি (সনাতন) ধর্মই। ভারতীয় বিশ্বাস মতে, শেষ নবী কলিযুগে/ আখেরী যমানায় আবির্ভূত হন (৫৭০ খ্রী.-৬৩২ খ্রী)। ইনিই হিন্দু পুরাণে বর্ণিত কল্কী অবতার বলে প্রতীতি জন্মে। বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা যাচ্ছে। হিন্দু পুরাণে (কল্কী পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে) শেষ অবতার কল্কী দেবের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তা আশ্চর্যভাবে ইসলাম ধর্মীয় শেষ নবী হযরত রসূলুল্লাহর জীবনীর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। যেমন, কল্কীর মাতা-পিতা-বিষ্ণু যশাঃ ও সমুতিকে নিঃসন্দেহে শেষ নবীর পিতা আব্দুল্লাহ ও আমিনা, আরবী শব্দের সাযুজ্য রাখে। কল্কী দেবের আগমণস্থল মরুময় 'সম্ভল দ্বীপ ও আরবী 'জাজিরাতুল আরবের' সঙ্গে মেলে। এতে আরও পাওয়া যায়, তাঁর চার বন্ধুর সাহায্যে ম্লেচ্ছ-নিধন ও সনাতন (সত্য ধর্ম) ধর্ম উদ্ধার প্রয়াসও হুবহু এক। বলাবাহুল্য কল্কীর মত হযরত রসূলুল্লাহও চার প্রাণপ্রিয় বন্ধুর সাহায্যে সত্যধর্ম ইসলামকে গ্লানিমুক্ত করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

এই চার বন্ধু হলেন তাঁর প্রখ্যাত চার ইয়ার-হযরত আবুবকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ)। ম্লেচ্ছ শব্দ 'কাফির'/নাস্তিক বোঝায়। এদের মধ্যে হযরত উমর ম্লেচ্ছবীর শশীধ্বজের মত একদিন মুক্ত-তলোয়ার হাতে হযরতের প্রাণনাশের চেষ্টাও করেন, পরেত তাঁর পায়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। শশীধ্বজ নামের সঙ্গে শশী অংকিত ইসলামী ঝান্ডাধারী ব্যক্তি বুঝাতে পারে। হযরত উমরও তাই ছিলেন।

বলাবাহুল্য, কল্কীর পিতামহের মত রসূলুল্লাহর পিতামহ হযরত আব্দুল মুত্তালিবও কাবাশরীফের প্রধান পুরোহিত ছিলেন।

তখন কাবাগৃহে ৩৬০ টি দেব-দেবী মূর্তি পূজিত হত। এই মূর্তিসমূহ বিনাসপূর্বক শেষ নবী সত্য-সনাতন ইসলাম ধর্ম পুনরুদ্ধার করেন। ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ অবিশ্বাসী/ কাফির, যারা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। মূর্তিপূজক সম্প্রদায়কে এখানে ম্লেচ্ছ বলা হয়েছে। কল্কী এই ম্লেচ্ছদের নিধন করে খ্যাতিলাভ করেন।

পবিত্র কুরআনের একটি সূরায় (সুরা ফীল-এ) রসূল পূর্ববর্তীকালে ইয়ামনের রাজা আবরাহা কর্তৃক কাবা-মন্দির ধ্বংস করতে এসে কি ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তার একটি সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বলা প্রয়োজন, তখন কাবাশরীফ বহু দেবমূর্তির যাদুঘর বিশেষ ছিল। পূর্বতন নবী হযরত ইব্রাহীমের সময়েও এই একই উপায়ে মূর্তি সংরক্ষিত ছিল।

কল্কী কর্তৃক ম্লেচ্ছ নিধনের বিবরণী যুক্ত একটি শ্লোক সংস্কৃত কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে পাওয়া যায়। যেমন-

"ম্লেচ্ছ-নিবহ নিধনে করয়সী করবালং
ধূমকেতুনিভ কিমপি করালং;
কেশব ধৃত কল্কী শরীরে
জয় জগদীশ হরে"।

মানে,

ম্লেচ্ছ নিধনের তরে ধুমকেতু সম
কি করাল তরবারিই না ধারণ করেছ,
হে কল্কী দেহধারী কেশব,
তোমায় জয় হোক।

এখানে কল্কী দেহধারী যে কেশবের কথা বলা হয়েছে, তিনি ভগবান কেশব নন- মনুষ্যরূপী (রক্ত-মাংসের) মানব কেশব। ইনি স্বয়ং ভগবান নন, ভগবানের বিভূতিযুক্ত মানব মাত্র। বলাবাহুল্য, বিভূতি মূর্তি নয়, মুসলমানী ভাষায়- আল্লাহর নূর/ জ্যোতিমাত্র (দেবজ্যোতি)। বাইবেলের ভাষায় একে Image বলা যায়।

আগেই বলা হয়েছে, শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান/ অবতার নন- নবী/ মানব-দূত মাত্র। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবও প্রমাণিত করেছেন, গীতায় অবতার-আগমণ সংক্রান্ত বাণী বিকৃত হয়েছে, মূল গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলা হয়নি। খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের বাঙালী কবি সৈয়দ সুলতানও তাঁর নবীবংশ কাব্যে শ্রীকৃষ্ণকে মুসলিম শাস্ত্র কথিত নবীদের শামিল করেছেন (১৫৮৪-৮৬) খ্রী।

তুলনীয় কুরআনে বর্ণিত রসুলুল্লাহর উক্তি- 'আনা বাশারুম মিসলুকুম ইউহ্যা ইলাইয়্যা।" মানে, আমি (নবী হলেও) তোমাদের মত (রক্ত মাংসের) মানুষ মাত্র, তবে আমার উপর ওহী/ দৈববাণী নাযিল হয়েছে। মানে নবীরাও মানুষ ব্যতীত নন। বৈষ্ণব সাহিত্যেও পাই, শ্রী চৈতন্য বলেছেন, "চৈতন্য ভগবদ্ভক্ত নচপূর্ণ নচাংশক" মানে, চৈতন্য ভগবদ্ভক্ত মাত্র, পূর্ণ মানব নন, বা অংশাবতারও নন। বলাবাহুল্য, চৈতন্য দেবকে তাঁর ভক্তদের কেউ কেউ অবতার বলে ঘোষণা করতেন, তার বদলে চৈতন্যদেব এই উক্তি করেন।

তথাপি মজার কথা হল মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যও ভগবানের পূর্ণ অবতার/ ভগবান সেজে বসেছিলেন।

ভাগবতে নেই, এমন কাহিনীও শ্রীকৃষ্ণের নামে চিরস্থায়ী আসন গড়ে বসেছে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের নৌকালীলা, দান লীলা ইত্যাদি। চৈতন্য চরিতামৃতের বিখ্যাত

কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজও স্বীকার করেছেন, এরূপ কাজ তাঁরা করেছেন স্বেচ্ছায় এবং ভক্তিগত চিত্তে। যেমন-

"দানখন্ড নৌকা খন্ড নাহি ভাগবতে
অজ্ঞ নহি কহি কিছু হরি বংশ মতে।
আর অপরূপ কথা অমৃতের ভান্ড
না লিখিল বেদব্যাস এই নৌকা খন্ড।
হরি বংশ লিখিয়াছে করিয়া বিস্তার।"

[শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ]

এভাবে দেবতাকে মানুষ নয়, মানুষকেই দেবতা বানিয়ে ফেলা হয়েছে। তাই দেখা যায়, মথুরা-দ্বারকার মানুষ শ্রীকৃষ্ণ নয়- বৃন্দাবন লীলাই সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক প্রধান বাহন হয়ে উঠেছে।

পক্ষান্তরে যারা মানুষের রক্তমাংসের কথা বলতে চেয়েছেন, তাঁরা অপাংক্তেয় হয়ে উঠেছেন। একালের মানবতাবাদী কবি জসীমউদ্দীনকেও তাই বলতে শুনি-

'মোরা জানি খোদ বৃন্দাবনেতে ভগবান করে খেলা।
রাজা-বাদশার সুখ দুঃখ নিয়ে গড়েছি কথার মেলা॥"

অবশ্য রাজা-বাদশাদের কথাও এসেছে পরে। রাজা বলতে আছেন রাখাল-রাজা শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীলীলা, বাংলা লোক সাহিত্যও ভরে উঠেছে রাখাল রাজার গানে। বাংলা ছড়াকারও নির্দ্বিধায় গেয়ে চলেছে-

"ও শ্যাম কানাই রে, ত্যালের বাটি গামছা হাতে
নিত্য যাও যমুনার ঘাটে,
ও তোর কলসী ভাসায়ে নিল সোঁতে রে।
শ্যাম কানাইরে।"

তাই বলাবাহুল্য, মধ্যযুগীয় বাঙালী হিন্দু জীবনে রাধা ছাড়া সাধা, এবং কানু ছাড়া গীত' ছিল অকল্পনীয়। একদিকে রাম আর অন্য দিকে কৃষ্ণ, উভয়েই ভগবান, কবি রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন, লোকসাহিত্যে শিব-দুর্গা ও রামচন্দ্রকে নিয়ে ঘরের কথা, অন্য দিকে রাধা, কৃষ্ণকে নিয়ে (বাঙালী হিন্দুর) সাহিত্য ও সংস্কৃতির জোয়ার বয়ে গেছে। আজও তার জের চলছে।

তাই বলতে বাধা নেই, আদি পিতা ব্রহ্মা প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ধর্ম (যাকে সনাতন ধর্ম বলা হয়েছে) কালে কালে ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তা-চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে পৌত্তলিকতার আধার হয়ে উঠেছে।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, এই আদি পিতাকে যদি ইব্রাহীম হিসেবে গ্রহণ করা যায়, তা হলে দেখব, হযরত ইব্রাহীম ছিল পূর্ণ তৌহীদ/ একেশ্বরবাদী চিন্তা-চেতনার নায়ক, আদৌ পৌত্তলিক নন।

আল কুরআনে তাঁকে মূর্তিপূজক তো দূরের কথা, তাঁকে মুর্তিভঙ্গকারীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

প্রথম জীবনে তিনি তাঁর পিতা (আজর) প্রতিষ্ঠিত মুর্তিসমূহ (৩৬০ সংখ্যক) ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন। চন্দ্র-সূর্যের গতিবিধি, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অবলোকন করে তিনি বিস্ময় মুগ্ধ চিত্তে স্রষ্টার অপূর্ব মহিমার কথা ভেবে ভক্তি আপ্লুত হয়েছিলেন, পরে তাঁর কৃতকর্মের অপরাধের জন্য স্বয়ং খোদা নামধারী রাজা নমরুদের অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন; আর আজ তাঁকে মূর্তিপূজক (সূর্যপূজক) এমন কি স্বয়ং সূর্য-দেবতা, অগ্নি দেবতা বলে অভিহিত করে তাঁরই পূজা প্রবর্তন করা হয়েছে। অথচ কুরআনে সম্পষ্টই বলা হয়েছে-

"কুলনা ইয়া নারো কুনী বারদাও
ওয়া সালামান আলা ইব্রাহীম।"

মানে, (আল্লাহ বলেছেন), আমরা বললাম, হে আগুন তুমি বরফ/ ঠান্ডা হয়ে যাও এবং ইব্রাহীমকে শান্তি দাও।

[-আল কুরআন ঃ ২১, ৬৯]

সঙ্গে সঙ্গে আগুন ঠান্ডা হয়ে গেলে।

কুরআনে ইব্রাহীমের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। তাই এ কাহিনীকে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। এই ইব্রাহীমের দুই পুত্র ইসমাঈল ও ইসহাকের বংশে পরবর্তীকালের সকল নবীগণের আবির্ভাব হয়েছে।

তাঁদের মধ্যে য়িহুদী ও খ্রীস্টান নবীই সকলে, একমাত্র শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) ছিলেন হযরত ইসমাঈলের বংশধর। এবং তিনি ছিলেন- প্রতিশ্রুত এবং শেষ নবী। হিন্দু ভাষায় সম্ভবতঃ কল্কি/ জগন্নাথ অবতার। তুং তুহি জগন্নাথ জগতে কহায়ত্রসী জগবাহির নহ মুঞি ছার।" (মৈথিল বিদ্যাপতির উক্তি।)

হযরত নূহের প্লাবনের পর কাবাশরীফ পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিন হযরত ইব্রাহীম এই মহানবীর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। এবং বলাবাহুল্য, এই সময়েই তিনি আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং পুত্রসহ উভয়কেই 'মুসলিম'/ আত্মনিবেদিত বলে ঘোষণা করেছিলেন।

সত্যি কথা বলতে কি, এই ঘোষণা বাণী থেকে ইব্রাহীমের বংশধরগণ মুসলিম/ মুসলমান, বলে পরিচিত হন। সম্ভবত: এই মুসলমান ও 'সনাতন' ধর্ম মূলত: এক ও অভিন্ন ছিল।

ভারতীয় ব্রহ্মবাদী তথা ব্রাহ্মণ্যবাদীগণ নিজেদেরকে 'সনাতন' ধর্মাবলম্বী ব'লে পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই সনাতন ধর্মকে 'ইসলাম' বলতে দোষ কি?

ইসলাম তো 'সনাতন' এবং শান্তিরই ধর্ম। এবং এ ধর্ম মানুষেরই ধর্ম, শুধু মুসলমান নামধারীর জন্য নয়। অবশ্য বর্তমান অবস্থায় এই দুই ধর্ম সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম হয়ে রয়েছে। পারসিক/ অগ্নুপাসকদের সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়।

উর্দু কবি আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল যথার্থই বলেছেন-

"থা বিরাহিম পেদর আওর পেছর আজর হায়"।

মানে, ইব্রাহীম ছিলেন মূর্তিভঙ্গকারী, তাঁর পিতা আজর ছিলেন মূর্তি নির্মাতা। আর আজ হয়েছে তার ঠিক উল্টো, ইব্রাহীম-নন্দনই আজ পিতা আজরে পরিণত হয়েছেন। অর্থাৎ মূর্তিভঙ্গকারী ইব্রাহীমের পুত্রেরাই আজ মূর্তি-নির্মাতা আজরে পরিণত হয়েছে। ইতিহাসও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

শুধু ভারত-বঙ্গে নয়, মূর্তিপূজক আর্য বংশধরগণ তাঁদের এই অভিনব মতবাদ প্রচার করেছেন। ইব্রাহীমের অব্যবহিত পরে ইরানে যরথুস্ত্র/ জরদুশতি তাঁর অগ্নি-পূজক (মজুসী ধর্ম) সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় বলা যায়,- "শ্যাম-কম্বোজে ওঙ্কার ধাম'ও নির্মাণ করেছেন (তুং 'আমরা' কবিতা)।

কৌতুহলের ব্যাপার সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে যে, ভারতীয় হিন্দু ধর্মের আদি নির্মাতাগণের কথা যেমন শ্রীরামচন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণ-কথা, রূপময় ভারত, তথা শ্যাম, কম্বোজ, বালি, সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ছেয়ে গেছে। এবং বলতে কি তাঁদের আদি-কালের স্মৃতি চিহ্নগুলি সেই সব দেশে বিদ্যমান থেকে তাঁদের পুণ্য স্মৃতি ঘোষণা করছে। অথচ খোদ ভারতবর্ষে তাঁদের তেমন কোনো স্মৃতি নেই। সম্প্রতি বিখ্যাত ভ্রমণকারী পন্ডিত রায় শঙ্কর তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে শ্যাম-কম্বোজ ভ্রমণ করে বিস্ময়কর তথ্যাদি পেশ করেছেন। তাঁর দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে যে সম্ভবত: থাইল্যান্ড- মালয়েশিয়াতেই বিখ্যাত রাম-রাবণের (রামায়ণ) যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর বিখ্যাত রূপময় ভারতের বিস্ময়কর কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন ইন্দোনেশীয় ভাষায় লিখিত মহাভারতে ভারতীয় হিন্দু-জীবনের জীবন্ত ছবি লক্ষ্য করে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন (সুনীতি চট্টোপাধ্যায়। সাংস্কৃতিকী ও

ভারত সংস্কৃতি গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য)।

বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে 'রামের জন্মভূমি' সম্পর্কে এতদসম্পর্কিত একটি বিবৃতি সুধী-সমাজের অবগতির জন্য পেশ করা হলো।

রাম ও কৃষ্ণের পর ভারতে বুদ্ধের নাম পাওয়া যাচ্ছে। বুদ্ধ মানে জ্ঞানী(< বোধি)। তাঁর কাল অনুমিত হয়েছে ষষ্ঠ খ্রীস্টপূর্বাব্দের দিকে। সমকালে চীনে কনফুঁসের কথা জানা যায়। আল কুরআনে 'যুল কিফল'/ মানে কপিলাবস্তুর অধিকারী/ রাজার নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত: ইনি একজন নবী হবেন। আরবীতে 'প' হরফ নেই, সম্ভবত: সে কারণে যুল কিফল বলা হয়েছে। বুদ্ধের কিতাবের নাম ত্রিপিটক। ত্রিপিটকে শেষ নবীর (মেত্তেয় বুদ্ধ/ মৈত্রেয় বুদ্ধের) ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়। কনফুসেঁও তাঁর পরে জনৈক ভাববাদীর আগমন- সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করেছেন বলে জানা যায়। ইনিও শেষ নবী মুহম্মদ হতে পারেন।

পরিশেষে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে কিছু কথা বলে আপাততঃ এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাক।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে সকল ধর্মগ্রন্থেই বিস্তারিত আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ আধুনিক বিজ্ঞানের অনুপস্থিতিতে শাস্ত্র-কথাই ছিল সকল চিন্তা-কল্পনার উৎস। তাই এই সব শাস্ত্র কথা ও লোক কথাই আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির মূল উৎস্য হয়ে আছে।

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ভারতীয় পন্ডিত ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়ের একটি কথা মনে পড়ছে। গত ১৯৭৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক ফোকলোর সেমিনারের দশম প্লেনারী অধিবেশনের সমাপ্তি অধিবেশনে (প্রধান অতিথির অভিভাষণে) তিনি অকপটভাবে স্বীকার করেন, এখন ফোকলোর বিষয়ে যে নতুন গবেষণার ধারা চালু হয়েছে, তাতে তাঁর আশংকা হয়, ফোকলোর শাস্ত্রবিদগণ শেষ পর্যন্ত হিন্দু শাস্ত্রসমূহকেই ফোকলোর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে বসবেন। কারণ, হিন্দুশাস্ত্র বলে কথিত শ্রুতি, স্মৃতি ও দর্শনের সবটুকুই তো মৌখিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত। তাই ফোকলোরের সংজ্ঞা যদি হয় লোক সংস্কৃতি, লোক স্মৃতি ইত্যাদি, তা হলে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র বলেই তো কিছুই থাকে না। কথাটি ধীর-স্থির হয়ে চিন্তনীয়। ডক্টর রায় ভুল বলেন নি। হিন্দু শাস্ত্র- বিচারে ফোকলোরকেই কেন্দ্র করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত আরও একটি কথা স্মরণে আসছে।

সে আমাদের ছাত্রজীবনের কথা। ম্যাট্রিক ক্লাসে ডঃ জগদীশ চন্দ্র বসুর একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। প্রবন্ধটির নাম 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে।' প্রবন্ধটি শুরু হয়েছিল এভাবে-

'গঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গঙ্গা তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?' সে বলিল, 'মহাদেবের জটা হইতে'।" বাস, জবাব শেষ। কিন্তু আসলে গঙ্গা কি মহাদেবের জটা থেকে এসেছে? তাই যদি হয়, তা হলে কি প্রশ্ন করা প্রয়োজন হবে না-গঙ্গা কে? আর মহাদেবই বা কে? আর কিভাবে গঙ্গার উৎপত্তি হল?

গঙ্গাভক্ত শ্রোতা হয়ত মহাদেব-গঙ্গার ভক্তিপূর্ত কাহিনী শুনে তৃপ্ত হবেন, কিন্তু আধুনিক সত্যসন্ধ বিজ্ঞানবিদ, বা বিজ্ঞান-পিপাসু কি তাতে তৃপ্ত হবেন?

এবার পূর্ব প্রসঙ্গে আসি। হিন্দু শাস্ত্রে আছে, স্রষ্টার হুঙ্কারে (ওঁ/ঔঁ) সৃষ্টির উদ্ভব হল। প্রথমে আদ্যাশক্তি কালী/ সারদা জগৎমাতার আবির্ভাব হল। জন্ম হল তিন মহাপুত্রের। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ইত্যাদি। তারপর যুগে যুগে যুগদেবতাদের আবির্ভাব হল। সৃষ্টি গুলজার হল ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হল- আধুনিক মানুষ কি এ শাস্ত্র কাহিনী মেনে সৃষ্টি-জগৎ সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে রাজী হবেন?

জবাব হবে 'না, কিছুতেই না'।

তা হল এখন উপায়? আর শাস্ত্র কথা কি সবই মিথ্যা এবং কাল্পনিক? তা হলে দখা যাক, এই সব শাস্ত্র কথার মূল কথাটি কি?

পূরাণে কথিত আছে যে, স্রষ্টার মুখ-নিঃসৃত বাণীর জোয়ারে সৃষ্টির উদ্ভব হল এবং ধীরে ধীরে বিকাশ হল। এতো সকল শাস্ত্রেরই কথা। তা হলে এ ঐক্য/ অনৈক্য, এলো কিভাবে? এবং তা প্রচারই বা করল কে?

এর জবাব দিতে গেলে আবার গোড়ায় আসতে হবে। মানে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে শাস্ত্রকারদের উক্তি পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

বর্তমান জগতে প্রচলিত ধর্মগ্রন্থের আদি হিন্দু শাস্ত্রীয় বেদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। এবার বেদের পরে বাইবেলের (পুরাতন ও নতুন) কথা বলতে হয়।

বাইবেল গ্রন্থের শুরুতেই আছে-

God created this Universe from His own image, did he make man'

মানে, God/ খোদা এই পৃথিবী তাঁর আপন সুরাতে গড়লেন। তিনি 'হও' বললেন, আর অমনি সব হয়ে গেল।

[ তিনি বললেন, আলো হোক, এবং আলো হয়ে গেল]

ইসলাম শাস্ত্রের কথাও তাই। হাদিস শরীফে আছে-

'খালাকা আদামা আলা সূরাতিহি'

মানে, 'আপন সুরাতে গড়লেন আদম দয়াময়'

-লালন শাহ

তা হলে পার্থক্য হল কি?

বলা প্রয়োজন, আরবী 'সুরাত' সংস্কৃত মূর্তি/ সুরাত এক নয়।

মিলাদে মুস্তফাতেও পাই-

উর্দু ভাষায়-

'জোহুর নূরে আহমদ ছে
হুয়া কুন-এ মাকা পয়দা
মালাক পয়দা ফালাক পয়দা
জমাঁ পয়দা জমাঁ পয়দা॥

তুং- আহমদের ওই মিমের পর্দা
উঠিয়ে দেখ মন
আহাদ সেথায় বিরাজ করে
হেরে গুণিজন।

-নজরুল ইসলাম

বলাবাহুল্য, এও সেই হিন্দুয়াণী আদি জ্যোতি/ তেজ/ সারদা/ সরস্বতী থেকে সব কিছু সৃষ্টির মত নয় কি?

অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে একই মনে হলেও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের কারণে এটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ধারণার জন্ম দিয়েছে।

সুখী সমাজের অবগতির জন্য একটু খুলাসা করা যাক। সারদা কি? কে?

যে মূল আদি জ্যোতি থেকে সৃষ্টিজগতের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে, হিন্দু শাস্ত্রে তাঁকেই সারদা/ সরস্বতী/ কালী বলা হয়েছে। ইসলামী পরিভাষায় এটি নূর/নূর-ই মুহম্মদী বলা হয়েছে। তবে পার্থক্যের মধ্যে হিন্দু শাস্ত্রে এই আদ্য জ্যোতির মানব-মানবী রূপে মূর্তিমতী হওয়ার কল্পনা করা হয়েছে, আর ইসলামে তার কোনো রূপ কল্পনা থেকে দূরে রাখা হয়েছে।

এই নূরকে নূর-ই মুহম্মদী/ মুহম্মদের নূর বলা হলেও তাকে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর উর্ধ্বে রাখা হয়েছে।

ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্বে নূর সম্পর্কিত ('নূর নামা' কাব্যে) বর্ণনার সঙ্গে হিন্দু সারদা-কল্পনার মূলে কোনো পার্থক্য ছিল মনে হয় না, তবে পরবর্তী ব্রাহ্মণ্যবাদী ধ্যান-ধারণা তাকে বিভ্রান্ত করেছে মনে হয়। নইলে সামবেদে বর্ণিত ওঁ ঙ্কার (ওঁ)

তত্ত্বে ও সুফী 'নূর-ই মুহম্মদী' তত্ত্বে পার্থক্য কোথায়?

আগেই বলা হয়েছে, ওঙ্কার তত্ত্বের দেবতা-ত্রয়কে যদি আদি পিতা-আদম/শিব, ব্রহ্মা/ ইব্রাহীম ও বিষ্ণু/কৃষ্ণ বলে ধরে নেওয়া যায়, তা হলে তো মানব জাতির বিপত্তি থাকে না।

কারণ, আদি পিতা-মাতা মানব- মানবী হবেন এটিই তো স্বাভাবিক। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে দ্বৈত, অদ্বৈত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রজাপতি, মহাদেব, দিতি-অদিতি ইত্যাদি রূপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তা'হলে সরস্বতী/ সারদা, দুর্গা/লক্ষ্মী/ কালী সম্পর্কেই বা আলাদা ভাবতে হবে কেন?

বাংলা শাক্ত পদাবলী ও শাক্ত চিন্ত-চেতনার আলোকে বিচার করলে আশা করি বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। যেমন, কবি বলেছে-

(ক) "জানোনারে মন পরম কারণ
কালী কেবল মেয়ে নয়,
সে যে মেঘেরই বরণ করিয়ে ধারণ
কখনও কখনও পুরুষ হয়।"

অথবা, কবির ভাষায়-

(খ) "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, রাম
সকল আমার এলোকেশী।
এখানে এলোকেশী মানে, কালী।"

(গ) "কালী, হলি মা রাসবিহারী
নটবর বেশে বৃন্দাবনে"

নটবর হলেন-শিব, কিন্তু এখানে-শ্রীকৃষ্ণ।

তুং তন্ত্র শাস্ত্রের একটি উক্তি-

"কলৌ কালী কলৌ কৃষ্ণ, কলৌ গোপাল কালিকা।

এখানে-সকলেই একাকার। স্রষ্টাকে এখানে কখন মাতা (জগৎমাতা) আবার কখনও পিতা (জগৎপিতা) বলে কল্পনা করা হয়েছে। তাই যদি হয়, তা হলে খ্রীষ্টান ধর্মের পিতা, খোদা; পুত্র খোদা ইত্যাদিও থাকে না।

সারদা মঙ্গলের কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী তো সারদাকে কবির ধ্যানের ধন লালটিকা মেয়ে' বলে সম্বোধন করেছেন। বলেছেন-

"তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি

হোক গে এ বসুমতী যার খুশী তার।

তাঁর 'সাধের আসনে' জনৈকা ভক্ত পাঠিকার একটি প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন-

'কাহারে ধেয়াই দেবি, নিজে আমি জানিনে।
কবিগুরু 'বাল্মিকীর ধ্যান ধরে চিনিনে
মধুর মাধুরী বালা
কি উদার করে খেলা
কেবল হৃদয়ে দেখি দেখাইতে পারিনে॥

তুং হাদিস শরীফের বাণী-

'কুলুবুল মুমিনীরা আরশুল্লাহ'

মানে, ভক্তের হৃদয়েই আল্লাহর আসন/আরশ অবস্থিত।
এই ধ্যান-ধারণা কি শুধু পৌত্তলিক হিন্দু কবির?
ফকীর লালন শাহ তাই রহস্য করে বলেছেন-

সাঁইয়ের লীলা বুঝবি খ্যাপা ক্যামন করে
লীলার যার নাইরে সীমা কোনখানে কি রূপ ধরে?
কখনও ধরে আকার
কখনও হয় নিরাকার
কেউ বলে আকার সাকার
অপার ভেবে হই ঘোলা॥
অবতার অবতারী সেও তো সম্ভব তারি
দেখরে মন জগৎ ভরি
এক চাঁদের সব উজ্জ্বলা।
ভান্ড কি ব্রহ্মাণ্ড মাঝে
সাঁই বিনে কি খেলা আছে
লালন বলে নাম ধরে সে
কৃষ্ণ, করিম কালা॥

এখানে কৃষ্ণ-হিন্দু দেবতা, করিম/করীম আল্লাহ তায়ালার এক নাম এবং কালা শব্দের অর্থ কৃষ্ণ কালা নয়-

"লা শরীকালাহু'। মানে, যার কোনো শরীক নেই।

তুং লালনের-

'নামটি লা শারিকালা
সবার শরিক সেই একেলা
আপনি তরঙ্গ আপনি ভেলা
আপনি খাবি খায় ডুবে।"

য়িহুদী-খ্রীস্টানদের বাইবেল কিতাবে এই একই লীলা বর্ণিত হয়েছে। অথচ সেখানেও হিন্দুয়ানী ত্রিত্ববাদী চেতনা ভীড় করেছে। সত্যসন্ধ য়িহুদী-খ্রীস্টান গবেষকগণও আজকাল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কিত এই ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত। এর মূলে কোনো শাস্ত্রীয় সমর্থনও নেই।

পরবর্তী খ্রীস্টান পাদরী সেন্ট পল ও তাঁর অনুসারীদের একটি স্বকপোল কল্পিত ধারণা ব্যতীত নয়। সত্যি কথা বলতে কি সেন্টপলের এই ধারণা আসলে য়িহুদী ধর্মের থেকে পাওয়া। য়িহুদীরাই খোদার পুত্র বলে হযরত ওজায়েরকে (আঃ) হাজির করেছিল। স্বয়ং সেন্ট পলও ছিলেন য়িহুদী ধর্মাবলম্বী। হযরত ঈসার রহস্যময় তিরোধানের পরে তিনি সুকৌশলে খ্রীস্টান ধর্ম অবলম্বন করে ধর্মীয় কর্তৃত্ব হস্তগত করেন। খ্রীষ্টান বাইবেলে না থাকলেও তিনি যীশুর উপর পুত্রত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টান ধর্মের (Trinitarian) প্রতিষ্ঠা করেন। এ নিয়ে খুন-খারাবীও কম হয়নি। বলতে কি এখনও তার জের চলছে। আর আজ দেখা যাচ্ছে, এই ত্রিত্ববাদের মূল ধারণাই এসেছে এই ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু-চেতনা থেকে। অথচ কৌতূহলের ব্যাপার, মূল ব্রহ্মবাদী চেতনাতেও এই ত্রিত্ব-চেতনাও অনুপস্থিত। উপরন্তু মূল ব্রহ্মবাদী চেতনা একেশ্বরবাদী চেতনা থেকে অভিন্ন। খ্রীস্টান-য়িহুদী ধর্মেও তাই। সম্প্রতি যিশু সহচর পাদরী বারণবস লিখিত ও প্রচারিত গসপেল গ্রন্থ তারই স্মারক (Gospel of Barnobas)। অথচ বেদান্ত গ্রন্থে স্পষ্টই ঘোষণা করা হয়েছে-

"একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ং নাস্তি, নেহ নানাস্তি কিঞ্জন।"
মানে, ব্রহ্ম এক, তিনি ব্যতীত আর উপাস্য কেউ নেই।
তুং "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ (মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ)।

মানে, নেই কোনো উপাস্য আল্লাহ ছাড়া, (এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁর রসুল মাত্র)। মুহম্মদের প্রসঙ্গ এসেছে অনেক পরে। আধুনিক ব্রাহ্ম-সমাজ এই মূল মন্ত্রেরই উপাসক। তবে পার্থক্যের মধ্যে তাঁরা শেষ নবী হিসেবে রসূলুল্লাহকে মানেন না। সাধক লালন তাই কঠোর ভাষায় এদের সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, 'নবী না মানে যারা মোয়াহেদ কাফের তারা। 'মোয়াহেদ' মানে একেশ্বরবাদী। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, সতেরো শতকের মুঘল যুবরাজ সাধক

দারা সিকোহ হিন্দু উপনিষদের ফারসী তরজমা করেছিলেন 'সিররুল আকবর'/ মহারহস্য নামে। তাতেও তিনি হিন্দু ত্রিত্ত্ববাদের সন্ধান পাননি। সেখানে পূর্ণ ইসলামী তৌহীদবাদের সামঞ্জস্য পেয়ে তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন। একালের কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথও অনুরূপভাবে বিস্ময়বোধ করেছিলেন।

[রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য। ১৯৭৩। পৃঃ -২২৩।]

অবশ্য এ-ব্যাপারে সম্রাট আকবর প্রবর্তিত 'দীন-ই-ইলাহী' ভিন্ন জিনিস। তাছাড়া দীন-ই-ইলাহী দেশবাসীর কাছে গৃহীতও হয়নি। এখানে তা আলোচনার স্থানাভাব। ইতিপূর্বে তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত কিছু বাণীর উল্লেখ করেছি, যে বাণী শাক্ত-পদাবলীর মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। এখানে মহানির্বাণ তন্ত্রের একটি বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করা যাচ্ছে, যার সঙ্গে পবিত্র আলকুরআনের বাণীর পূর্ণ সামঞ্জস্য মিলছে। যেমন, হিন্দু আদ্যাশক্তি সারদা/ সরস্বতী/ কালীর শানে বলা হয়েছে–

"অসিত গিরিসমং শ্যাত কজ্জলাং সিন্ধু পাত্রে।
সুর তরুবর শাখা লেখনী, পত্র মুর্বী,
লিখিত্বা সারদা সর্বকালং/ তব গুণানামিষ পারং ণ যাতি।"

মানে, কৃষ্ণবর্ণ পর্বত সদৃশ কালি যদি সিন্ধু পাত্রে রাখা হয়, এবং পৃথিবীর সকল গাছের শাখা লেখনী হয় এবং হে সারদা, যদি অনন্তকাল ধরে তোমার গুণরাজি লিখিত হয়, তবু তা শেষ হবে না।

তুং পবিত্র কুরআনের-

"লাও কানাল বাহারো মেদাদান লে কালিমাতু রাব্বী,
লা নাফিদাল বাহারো, কাবলা আন তানফাদা কালিমাতু
রাব্বী ওয়া লাও যি'না বে মিসলিহি মেদাদা।"
(আল কুরআন। সুরা কাহফি। ১৮ঃ১০৯)

অর্থাৎ তুমি বল, হে মুহম্মদ, যদি আমার প্রতিপালকের কালিমাহ/ বাক্যাবলী প্রকাশের জন্য সকল সমুদ্র কালিতে পরিণত হয় (এবং তদ্বারা তাঁর বাক্যাবলী/ গুণাবলী লিখিত হয়) কালী ফুরিয়ে গেলে আবার তৎসদৃশ কালী প্রদত্ত হয়, তাতেও তার গুণাবলীর বর্ণনা শেষ হবে না।

উল্লেখ্য, এখানে আমাদের প্রতিপালক/ রব্বের/ কালিমাহ/ বাক্যাবলীর কথা বলা হয়েছে। পূর্বতম উদ্ধৃতিতে যে সারদার গুণাবলী 'গুণনামিষ' এর কথা বলা হয়েছে তা কি সমতালীয় নয়?

হিন্দু শাস্ত্রে সারদার নামান্তর 'সরস্বতী; 'বাণী' 'কালী' ইত্যাদি এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এবং সারদার কোনরূপ/ আকৃতি নেই। এ নিতান্তই মনোময় রূপ।

ইংরাজিতে একে বলে 'image' আরবীতে 'নূর', 'সুরাত'/ ইত্যাদি।

শেষ কথা-

তাই বলতে বাধা নেই, সকল ধর্মেরই মূল কথা ছিল -তৌহীদ/ একত্ববাদী চেতনা, কালে কালে তা রূপক, প্রতীক ইত্যাদি ভাষার আড়ালে বিকৃত হয়ে নানা মত ও পথের সৃষ্টি করেছে। ইসলাম ও আলকুরআন সেই সব বিকৃত ধর্ম ও মতের পার্থক্য ঘুচিয়ে এক শান্তি-নিকেতনের পথে আহবান করেছে। কুরআন তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিয়েছে-

"ওয়াল্লাহু ইয়াদ-উ এলা দারুস সালাম"

{আল কুরআন। সুরা ইউনুস। আয়াত-১৫}

মানে, এসো হে মানুষ, এসো শান্তি নিকেতন/ দারুস সালামের পানে।

'দারুস সালাম' অর্থ শান্তি নীড়/ শান্তির নিকেতন। ইসলাম ধর্মকেই এখানে শান্তি নিকেতন বলা হয়েছে। যারা এই শান্তি নিকেতনে আশ্রয় নেয়, তারাই মুসলিম/ শান্তিপ্রাপ্ত ও আল্লাহতে আত্ম-নিবেদিত।

তুলনীয় হিন্দু ধর্মের-

"ওঁ তৎসৎ, ওঁ শান্তি"।

কিন্তু কে কার কথা শোনে?

॥ দুই ॥

# 'ঈশ্বর 'আল্লাহ' তেরে নাম

স্রষ্টা ও সৃষ্টি নিয়ে মানুষের ভাবনার অন্ত নেই।

কে এই স্রষ্টা, আর সৃষ্টিকর্মই বা কী?

কিন্তু এর মীমাংসা দেবে কে?

সাধারণভাবে এরূপ একটি সমাধান হতে পারে,-

এক অশরীরী দৈব শক্তি, যার ইচ্ছাতে এবং হুকুমে এই সৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে এবং তাঁর ইচ্ছাতেই সব ঠিকঠাক চলছে। কিন্তু কৌতূহলের ব্যাপার হ'ল-তিনি অদৃশ্য।

কথাটি বিশ্বাসযোগ্য কি?

মানব মনে নানান প্রশ্ন।

সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়, তবে পার্থিব জ্ঞানের আলোকে যতদূর জানা যায়, তার এরূপ।

আল কুরআনে আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে যে সব উক্তি আছে, তার আলোকে 'আল্লাহ' ও তার সমতালীয় শব্দগুলির ব্যাখ্যা করা যাক।

প্রথমেই ভারতীয় উপ-মহাদেশের কথা। ভারতীয় ধারণা অনুযায়ী ঈশ্বর ও আল্লাহ হল মূল স্রষ্টার নাম। কিন্তু ভারতীয় হিন্দু ও মুসলিম দৃষ্টিকোণে বিচার করলে যা দাঁড়ায় তা হল এইরূপ-

ভারতীয় হিন্দুগণ আল্লাহকে ঈশ্বর ও ভগবান নামে অভিহিত করেন। গোষ্ঠীগত দৃষ্টিকোণে তা বিকৃত হয়ে যা দাঁড়ায় তাতে ঈশ্বর ও আল্লাহ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থদ্যোতক হয়ে দাঁড়ায়। যেমন,

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে একটি ঘটনার কথা স্মরণ করি। ঘটনাটি এই- দুজন বাঙালী যুবকের মধ্যে বাক-বিতন্ডা চলছে 'ঈশ্বর' না আল্লাহ? 'আল্লাহ' না ঈশ্বর?

পাবনা জিলার একটি মাধ্যমিক স্কুলের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যুবকের মধ্যে ঝগড়া বেধেছে।

একজন হিন্দু, আর একজন মুসলমান। হিন্দু ছেলেটি ক্লাসে বাংলা পুস্তক পাঠ কালে 'আল্লাহ' ও 'খোদা' স্থানে 'ঈশ্বর' ও 'ভগবান' পড়ছে। যেমন পাঠ্য বই-এ আছে 'ঈশ্বর নিরাকার চেতন্য স্বরূপ' এবং 'আল্লাহ করুণাময় দয়ার নিধান'। হিন্দু ছেলেটি নির্দ্বিধায় পড়ে যাচ্ছে- 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ' কিন্তু 'ভগবান করুণাময় ও দয়ার নিধান'। অর্থাৎ আল্লাহকে সে মানে না। শিক্ষক হিন্দু, কানে শুনে যান, কিছু বলেন না। একদিন দেখা গেল, একটি মুসলমান ছেলে পড়ছে-আল্লাহ নিরাকার চৈতন্য 'স্বরূপ' এবং 'খোদা করুণাময় দয়ার নিধান'।

শিক্ষক ভুল ধরলেন। 'ঈশ্বর স্থলে আল্লাহ পড়লে কেন'?

ছাত্রটি- ওযে 'আল্লাহ' স্থলে 'ঈশ্বর' পড়ল।

শিক্ষক ধমক দিলেন 'খবরদার, এরূপ আর পড়বে না'।

কিন্তু হিন্দু ছেলেটিকে কিছু বললেন না। সে তার কাজ চালিয়েই যাচ্ছে। ফলে মুসলমান ছেলেরাও জিদ ধরল, তারা কখনই 'আল্লাহ' স্থলে 'ঈশ্বর' বা 'খোদা'

স্থলে 'ভগবান' বরদাশত করবে না।

বিষয়টি অত্যন্ত তুচ্ছ, কিন্তু একদিন দেখা গেল- 'ঈশ্বর-আল্লাহ' আর 'ভগবান-খোদা' নিয়ে ভারতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধীকেও ভাবিয়ে তুলল।

এলো ভঙ্গভঙ্গ তথা স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১)। হিন্দু-মুসলমান জননেতাগণ-এর সমাধানে এগিয়ে এলেন। নতুন নতুন শ্লোগান তৈরি হল। সাম্প্রদায়িকতা রুখতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা? হাঁ সাম্প্রদায়িকতাই তো।' লেখা হলো-

'রাম রহীম না জুদা কর ভাই
দিলকো সাচ্চা রাখোজী।'
অথবা,

রচিত হল-রামধুন সঙ্গীত-

'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিত পাবনা সীতা রাম
ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম
সব কো সমুতি দে ভগবান।"

তুং "মুসলমানে বলে আল্লাহ
গড বলেছে যিশুর চেলা
পানি খেতে যায় এক দরিয়ায়।"

কিন্তু জুত ধরল না।

বড্ড বেশি দেরী হয়ে গেল। কেউ কারো কথা শুনতে চাইল না। তাই আবার ফারসী কবি হাফিযের মুখের বাণী দেওয়া হল-

"হাফিয আগার ওছোল খালি
ছেলাহকুল ওয়া খাস আম।
ব-মুসলমান আল্লাহ আল্লাহ
ব- বরহামন রাম রাম॥"

অর্থাৎ মুসলমানদের 'আল্লাহ' এবং ব্রাহ্মণদের রাম নাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশ-বিভক্তি রোধ করা গেল না। বাংলাদেশ বিভক্ত হয়ে গেল পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা। অবশ্য স্বদেশী আন্দোলনের ধাক্কায় সাময়িকভাবে এই বিভক্তির একটি সুরাহা হল। দুই বাংলা আবার মিলিত হল। কিন্তু দাগ রয়ে গেল। সেই দাগের সূত্র

ধরে আবার বৃহত্তর ভারত দুই ভাগ হয়ে গেল। জন্ম লাভ করল দুইটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের (ভারত ও পাকিস্তানের)। কিছুদিন গেল। আবার পাকিস্তান দ্বিধা বিভক্ত হয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্ম হল (২৬ মার্চ, ১৯৭১)। পাকিস্তানও আলাদা হয়ে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার পরিণাম কী হবে এখনও বলা যাচ্ছে না। 'এপার বাংলা'/ ওপার বাংলারও লড়াই চলছে। অবশ্য আমাদের এ আলোচনার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই, তবে দেশের গায়ে কাটা দাগটি আজও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আবার মূল বিষয়ে আসা যাক। বৃহত্তর ভারতে রাম-রহিমের লড়াই আবার প্রবলতর হয়ে উঠেছে।

রঘুপতি রাঘব আবার রাম মন্দির নিয়ে মেতে উঠেছেন। তার পাল্লায় পড়ে মুঘল সম্রাট বাবরের নামে প্রতিষ্ঠিত মসজিদে (বাবরী মসজিদে) তার আঘাত এসে লাগছে। তুল-কালাম কাণ্ড।

শুধু রাম মন্দির নয়, শ্রীকৃষ্ণের নামে প্রতিষ্ঠিতব্য শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের কথাও শোনা যাচ্ছে। সম্প্রতি আবার জগদ্বিখ্যাত তাজমহল নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বলাবাহুল্য, হিন্দু দেবতা তো আর এক আধটি নয়, এর পরেও আছে ব্রাহ্ম-মন্দির, কালী মন্দির, শিব মন্দির ইত্যাদি।

অবশ্য পাশ্চাত্য God (গড) Jahuwa (জেহোবা) ইত্যাদির নামে মন্দির বা গীর্জার দাবি এখনও ওঠেনি। এখন প্রশ্ন হতে পারে, এই সব প্রতিদ্বন্দ্বী দেব-দেবীদের আগমণকাল কবে? তার কি কোনো ইতিহাস আছে, না, তার কোনো বাস্তবতা আছে? যতদূর জানা যায়, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌত্তলিক ঈশ্বর-ভগবানের ধারণা প্রাচীনতম। সম্ভবতঃ তার পরে আসে য়িহুদী ও খ্রীস্টান ধর্মীয় God সদাপ্রভু যিশুর মনোভাব। সর্বশেষে আসে ইসলামী তথা মুসলমানী 'আল্লাহ, খোদা' ইত্যাদি চেতনা। অবশ্য চিন্তা-চেতনার ধারায় ইসলামী তথা মুসলমানী চেতনাই প্রাচীনতম। তারপরে আসে য়িহুদী-খ্রীস্টানী চেতনা। আল কুরআনের দাবি মতে, অবশ্য ইসলামী চেতনাই প্রাচীনতম। তবে তার সর্বশেষ প্রকাশ ঘটে শেষ নবী হযরম মুহম্মদ (সঃ) প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে (৫৭০-৬৩২) খ্রীঃ-।

অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ্যবাদী (হিন্দু) ধর্মকেই সবচেয়ে প্রাচীন মনে করা হয়। নামান্তর, আর্যধর্ম। এদের আগমনকালও ধরা হয় য়িহুদী- খ্রীস্টান ধর্মেরও

পূর্বকালে (প্রাগৈতিহাসিক কালে)। সে যাই হোক, ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সম্প্রদায়ের দাবি অনুসারে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারাই এদেশে আদি ধর্মমতের স্রষ্টা। ব্রহ্মা থেকে ব্রাহ্মণ্য (< ব্রাহ্মণ থেকে) ধর্মের প্রচলন। বর্তমানে এদেরকে হিন্দু বলা হয়। হিন্দু ধর্ম নিতান্তই ভারতীয় (হিন্দুস্তানী)। হিন্দুস্তানী বেদ-বেদান্ত ইত্যাদি গ্রন্থে এই ব্রহ্মের কথা এসেছে। কিন্তু ইদানীংকালে আবিষ্কৃত 'মোহেনজোদাড়ো' 'হরাপ্পা'র প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে দেখা যাচ্ছে, এই ব্রহ্মা-চেতনার মূলে বর্তমান ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌত্তলিক চেতনা নয়, একেশ্বরবাদী তৌহীদ/ নিরাকার উপাসনার কথাই মুখ্য ছিল। এই সঙ্গে ভারতের আদিবাসী দ্রাবিড় ইত্যাদি জাতির কথাও আস। যথা স্থানে সে কথা আলোচনা করা যাচ্ছে। আবারো-উনিশ শতকের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ মনীষী রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজের ইতিহাসেও তার সমর্থন মেলে। তবে কি ব্রহ্মা হিন্দু ধর্মের তথাকথিত আদি দেবতা নন? তাঁর ধর্মমর্তের মূল কথাই তো হল-

'এক ব্রহ্মা দ্বিতীয় নাস্তি'।
মানে, এক ব্রহ্মা ছাড়া দুই নাই।

তুং- ইসলাম ধর্মীয় মূল কলিমাহ-
"লাইলাহা ইল্লাল্লাহ"
মানে, নেই কোন মাবুদ/ উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত।

স্পষ্টই বোঝা যায়, আধুনিক হিন্দু ভারতের অগ্রপথিক রামমোহন- রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে তাই ইসলামী তৌহিদী চেতনার সাযুজ্য নিতান্তই প্রত্যক্ষ গোচর। তাঁরা ধর্মত পৌত্তলিক হলেও চিন্তা-চেতনায় নিতান্তই নিরাকার আল্লাহ্‌বাদী। য়িহুদী-খ্রীস্টানী মতের সঙ্গেও তাদের সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রভক্ত ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যও তাই লক্ষ্য করেছেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনা না ব্রাহ্মণ্যবাদী, না পাশ্চাত্য, বরং তার সঙ্গে ইসলামী সুফী- চেতনার সামঞ্জস্য বেশি। এ- কারণেই বাংলার বিখ্যাত সুফী (মরমী) কবি লালন শাহের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে তার সাযুজ্য বেশি (রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য। কলি, ১৯৭৩। পৃঃ ২২৩)

আর কৌতুহলের ব্যাপার, কবি লালন শাহ রামমোহনকে তাঁর সমমর্মী মনে করলেও তাঁকে পুরাপুরী একশ্বরবাদী না বলে, বলেছেন- 'মোয়াহেদ'। শব্দের

মানে, একেশ্বরবাদী (তৌহিদী) চিন্তা-চেতনার অধিকারী হলেও তিনি কাফের/ অবিশ্বাসী শ্রেণীভুক্ত। যেমন, লালনের ভাষায়-

'নবী না মানিল যারা
মোয়াহেদ কাফের তারা
সেই কাফের দায়মাল হবে
বে হিসাব দোজখে যাবে
আবার তারে খালাস দিবে
লালন কয় মোর কি হয় জানি॥

অর্থাৎ লালন বলতে চান, এক আল্লাহতে শুধু বিশ্বাসী হলেই চলবে না, তাঁকে নবীবাদ/ নবুয়ত মেনে চলতে হবে। উল্লেখ্য এক্ষেত্রে আদি পিতা হযরত আদমের কাল থেকে ধরতে হবে।

অর্থাৎ ইসলাম মতে, 'তৌহিদ' ও রিসালাত', মানে, এক আল্লাহ তত্ত্বে বিশ্বাস এবং তাঁর প্রেরিত ঐশী কিতাবে বিশ্বাস করে চলতে হবে।

রাম মোহনের এই শেষোক্ত বিশ্বাসে ত্রুটি ছিল। তিনি কুরআন মানতেন, কিন্তু রিসালাত/ নবীবাদ মানতেন না।

এবার ধর্ম গ্রন্থে আল্লাহ/ঈশ্বর বিশ্বাস সম্পর্কীয় ধারণা প্রসঙ্গে আসা যাক। "আল্লাহ শব্দের মূল অর্থ কি?

আল কুরআনে পাই-

| বাংলা | আরবী | ইংরেজী |
|---|---|---|
| তিনি আল্লাহ | লা ইলাহা | He is Allah |
| যিনি ছাড়া নেই, কোন | ইল্লালাহ | Beside Whom there is no |
| মাবুদ/ উপাস্য | | Other God (God). |

এখানে 'ইলাহ্' শব্দটি লক্ষ্যযোগে [তুং ইলয়, ইলি, ইলোহিম]

উল্লেখ্য, 'আল্লাহ' শব্দটি পৌত্তলিক আরবদের মধ্যে অজানা ছিল না, তবে তারা শব্দটি প্রতীক দেবতা অর্থে ব্যবহার করত। যেমন, তাদের বহু দেবতার মধ্যে বিখ্যাত দেবতা ছিল 'আল্ লাত', 'আল মানাত' ও 'আল ওজ্জা' প্রভৃতি। কিন্তু এক ও অবিনশ্বর স্রষ্টা (আল্লাহ) হিসেবে তাঁকে জানত না। পবিত্র আল্

কুরআনে স্রষ্টা অর্থে 'আল্লাহ' (< আল্ লাত?) শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

অবশ্য কুরআন-পূর্ব খোদায়ী কিতাবসমূহে 'ইলাহ' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, যার অর্থ আল্লাহ শব্দের সমতালীয় বলা যায় [< তুং ইলোহিম), যেমন, পবিত্র বাইবেল কিতাবে আছে, মহাত্মা যিশুকে ক্রুসে বিদ্ধ করার সময়ে তিনি গভীর বেদনায় কাতর স্বরে চীৎকার করে বললেন "এলয়, এলয় (এলি, এলি) লামা সাবাকতানী' [বাইবেলের ভাষায় Eloi, Eloi, Lama Sabackthani (mark : 15.34); অথবা "Eli Eli, Lama Sabackthani (Matthew : 27. 46)] মানে, 'এলি, এলি, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে'? এখান 'Eloi, Eli, নিঃসন্দেহে খ্রীস্টানদের কাছে জিহোবা/ Yahuwa অথবা হিব্রু ভাষায় আব্বা/ পিতা শব্দের সমতালীয়। অর্থাৎ যিশুর প্রার্থনা ছিল সর্বপ্রদাতা আল্লাহতায়ালারই কাছে (কোনো পার্থিব পিতার কাছে নয়)। কৌতুহলের ব্যাপার, বাইবেলে এরই সমতালীয় আরও একটি শব্দ মেলে 'Allelu ya'/ গভীর ধ্যানমগ্ন খ্রীস্ট ভক্তের এ এক বিস্ময়-সূচক স্বীকারোক্তি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি একজন আল্লাহ ভক্তের বিস্ময়সূচক "ইয়া আল্লাহ'/ 'আল্লাহু আকবর' উক্তির সমতালীয়।

উল্লেখ্য, হিব্রুতে, এমনকি আরবীতেই এই ya/ ইয়া বিস্ময়-সূচক অর্থে ব্যবহৃত। শুধু আল্লাহ শব্দটিই নয়, হিব্রু ভাষার সঙ্গে আরবী ভাষার শব্দ, এমন কি উচ্চারণের গভীর সাদৃশ্য বিদ্যমান। উদাহরণ, যেমন-

| হিব্রু | আরবী | বাংলা অর্থ |
|---|---|---|
| Eli, Eloi, Elah | Ilah | আল্লাহ, খুদা |
| Elohim; | | |
| Ikhud | Ahad | এক |
| Yaum | Yaum | দিন |
| Shaloam | Salaam | সালাম, শান্তি; |
| Yahuwa | YaHua | ওঃ তিনি (যিহোবা)। |

(Yat, Huh, Wav Huh (The Choice, pp 249-253)

বলাবাহুল্য, আরবীতে আল্লাহ শব্দের ব্যাকরণগত বা অর্থগত কোন বিবর্তন নেই। অর্থাৎ লিঙ্গ, বচন এবং অর্থান্তর ইত্যাদি হয় না। পক্ষান্তরে, সংস্কৃত/ বাংলা ভাষায় ঈশ্বর শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে ঈশ্বরী হয়, ভগবান শব্দে ভগবতী হয়। জগৎ-পিতা,

জগৎ মাতা শব্দেরও অস্তিত্ব আছে। আবার ইংরাজিতে (God) শব্দটির ছোট হরফে লিখলে হয় দেবতা (god, ছোট খোদা), Godling মানে ক্ষুদ্রতর কিছু, আবার 'God-Father', 'God-mother' অর্থে অভিবাবক (আল্লাহ ছাড়া) বোঝায়। কিন্তু আরবী আল্লাহ শব্দে একমাত্র স্রষ্টা ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না (আল্লাহ-পিতা, আল্লাহ-মাতা ইত্যাদি হয় না।)। আল কুরআনে আল্লাহর পূর্ণ একত্ব এবং সুন্দরতম নামের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে এখানে সামান্য উদ্বৃতি দেয়া যাচ্ছে। আল কুরআনের ভাষায়-

"হুয়াল্লাহুল লাযী লাইলাহা ইল্লা হুয়া,
আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাত,
হুয়ার রাহমানুর রাহীম।
হুয়াল লাহুল লাযী লাইলাহা ইল্লা হুয়া;
আল মালিকুল কুদ্দুসুস্ সালামুল মুমিনু ওয়াল মুহাইমিনুল
আযীযুল জব্বারুল মুতাকাব্বির;
সুবহানাল্লাজি আম্মা ইয়ুশরিকুন।
হুয়াল্লাহুল খালিকুল বারীউল্ মুসাভভিরু
লাহুল আসমাউল হুসনা;
ইউসাব্বিহু লাহু মা ফীস্সামাওয়াতি
ওয়াল আরদি;
ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকীম"।

-(আল কুরআন। ৬৯ঃ২২-২৩)

অর্থাৎ তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ/ উপাস্য নেই;
তিনি প্রকাশ্য এং গোপন সব বিষয়ই অবগত;
তিনি সর্বপ্রদাতা, করুণাময়।
তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই;
তিনিই মালিক, শান্তিদাতা, নিরাপত্তা প্রদানকারী;
অভভাবক, মহাপরাক্রান্ত প্রতাপশালী, মহিমাময়;
তারা যে অংশী স্থির করে আল্লাহ তার চেয়েও পবিত্র;
তিনি আল্লাহ, তিনি খালিক/ সৃষ্টিকর্তা, তিনি সু-নির্মাতা,

সু-আকৃতিদাতা; তাঁর জন্য রয়েছে অত্যুত্তম নাম সমূহ।
আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, তা তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করে,
এবং তিনি মহা পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।

আসমাউল হুসনা, অর্থ সর্বোত্তম নামসমহূ। নামগুলির মধ্যে 'আল্লাহ'ই প্রথম এবং সর্বপ্রধান।

সর্বোত্তম নাম?

হাঁ, সর্বোত্তম তো তিনিই।

আল কুরআনে আরও বলে-

"বল, তাঁকে আল্লাহই বল, আর রহমানই বল, যে নামে খুশী তাঁকে ডাক, কারণ তাঁর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ।

(আল কুরআনঃ ১৭ঃ১০)

আসলে তিনি যে সর্বনাম, যে নামেই ভক্ত তাঁকে ভক্তিভরে ডাকে, তিনি তাতে সাড়া দেন।

ফারসী কবি হাফিয কি চৎকারই না বলেছেন-

"ব- নামে আঁকে হেজ, নামে না দরদ।
বাহার নামে কে খানি সর্ বর আরদ॥

মানে, নামে কি আসে যায়, যে নামেই তাঁকে ডাকা যায়, তিনি তাতেই সাড়া দেন।

তুং রবীন্দ্রনাথের-

"আমি কিন্তু ডেকেই বসি
যেটাই মনে আসুক না,
যারে ডাকি সেই তো বোঝে
আর সকলে হাসুক না।"

বস্তুত এই -ই আল্লাহর প্রকৃত স্বরূপ।

আল্লাহ আমাদের এ সত্য বুঝবার ও গ্রহণ করবার তৌফিক দিন। আমিন।

॥ তিন ॥

# আল কুরআনের দৃষ্টিতে মূর্তিপূজা ও অন্যান্য ধর্ম

প্রাচীন মিসরীয়/ ইবরানী ভাষায় 'হারমাস' শব্দের অর্থ জ্যোতিষী/ জ্যোতির্বিদ। ঐতিহ্য সূত্রে জানা যায়, জ্যোতিষী/ জ্যোতিবিদ্যা মিসরীয়দের অবদান। জ্যোতির্বিদ্যার আদিপুরুষ ছিলেন আল কুরআনে বর্ণিত হযরত ইদ্রীস (আঃ)। তাঁকে জ্যোতির্বিদদের আদি-পুরুষ/ "হারমাস উল হারামিসা' বলা হত। আখেরী নবী রসুলুল্লাহ তাঁর হাদিস শরীফে সরাসরি তাঁর নাম না করলেও এ-কথা স্বীকার করেছেন যে, তিনি একজন প্রাচীন নবী ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ বিশেষ করে কুরআন গবেষকগণ, হযরত ইদ্রীস (আঃ)কে এই নবী বলে শনাক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন, হযরত ইদ্রীসই সর্বপ্রথম (জ্যোতিষ শাস্ত্রের উদ্ভাবন করেন। শুধু তাই নয়, দুনিয়ায় তিনিই প্রথম 'কলম' আবিষ্কারক। লিখন- পদ্ধতিরও আবিষ্কারক তিনিই। তিনি চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রের গতিবিধি, আসমান সৃষ্টির কৌশল, অঙ্কবিদ্যা, গণিত ও সংখ্যা গণনা পদ্ধতিরও আবিষ্কার করেন ও লিপিবদ্ধ করেন। সম্ভবতঃ সে কারণে প্রাচীন মিসরীয়গণ তাঁকে জ্যোতির্বিদ্যার আদিগুরু বলেছেন। তাঁর যথার্থ পরিচয় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এ কথা সর্ববাদী সম্মত যে, তিনি প্রাচীন মিসরের একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্বের সর্বপ্রথম জ্যোতির্বিদ, বিজ্ঞানী। তিনি মিসরের 'মানসাক' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যতদূর জানা যায়, তিনি ছিলেন আদি-পিতা হযরত আদমের পুত্র হযরত শীছ (আঃ)-এর একজন অন্তরঙ্গ শাগরিদ এবং হযরত নূহ (আঃ) এর পরদাদা/ প্রপিতামহ। হযরত শীশের নামান্তর ছিল গওসাজীমুন, অর্থ পুন্যশীল।

ঐতিহ্য সূত্রে জানা যায়, হযরত ইদ্রীস সমকালীন জগতে প্রচলিত সব কটি ভাষা জানতেন এবং সব ভাষাতেই কথাবার্তা বলতে পারতেন। যাদের সংখ্যা ছিল ৭২ (বাহাত্তর)।

মিসরীয়/ ইবরানী ভাষায় তাঁর নাম ছিল 'খনুক'। (> আ. আখনুক)।

কথিত আছে, হযরত নূহের আমলের মহাপ্লাবনের পরে যখন বিশ্বব্যাপী মানব-সমাজের নতুন বসতি স্থাপিত হয়, তাঁর অনুসারিগণ দূরদৃষ্টি বলে তাঁর ছবি ও মুর্তি প্রস্তুত করে তা প্রতিষ্ঠিত করে। এবং চন্দ্র-সূর্য গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিবিধির লক্ষ্যে নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করে। যার বৈশিষ্ট্য ছিল- চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রাদির উদয়-অস্ত লক্ষ্যে আল্লাহর নামে পশু-পাখী কুরবাণী ও ঈদ/উৎসব প্রতিষ্ঠা করা। অনুমিত হয়, পরবর্তী কালে এ থেকে বিবিধ জীব-জন্তু হত্যা করে বলিদান ও

প্রকৃতি পূজা ইত্যাদির প্রর্বতন হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষও ছিল এই পৌত্তলিকতা বা প্রকৃতি পূজার অন্যতম স্থল। হযরত ইদ্রীস একেশ্বর বিশ্বাসী নবী ছিলেন, তাই পৌত্তলিকতা/ প্রকৃতি পূজা তাঁর ধর্মনীতির বহির্ভূত ছিল মনে করা যেতে পারে। তাঁর ধর্মমতকে বলা হত 'দীন-ই ইদ্রীসী' বা হযরত ইদ্রীসীয় ধর্ম। এতে পৌত্তলিকতার স্থান ছিল না। পরবর্তী সাবেয়ীগণ সম্ভবতঃ এদেরই উত্তরসুরী ছিল। আর কুরআনে ধর্মজগতে ইসলাম, য়িহুদী, খ্রীস্টান/ নাসারাদের সঙ্গে সাবেয়ীদেরও নাম করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারাও যদি সৎ পথানুবর্তী, মানে, আল্লাহর অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস ও পরকালে বিশ্বাস রাখে এবং সৎকর্মশীল হয় তবে আল্লাহর রহমৎ থেকে বঞ্চিত হবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সব ধর্মের কোনো বিশ্বস্ত ইতিহাস মেলে না। বাংলা সাহিত্যে কবি কালিদাস রায়ের একটি কবিতায় সম্ভবতঃ এই সাবেয়ীদের স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াস আছে। কবিতাটির নাম 'ইব্রাহীম ও কাফের'।

সংক্ষেপে তার কাহিনীটি এই। হযরত ইব্রাহীমের একটি রীতি ছিল যে, তিনি প্রতিদিন আল্লাহর ওয়াস্তে রোজা রাখতেন এবং প্রতি সন্ধ্যায় একজন অতিথিকে নিয়ে ইফতার করতেন। একদিন হল কি, একজন আগ্নুপাসক অতিথি তাঁর সঙ্গে ইফতারে বসলেন। হযরত ইব্রাহীম আল্লাহর নাম স্মরণ করে/ বিসমিল্লাহ বলে ইফতার শুরু করলেন, পক্ষান্তরে অতিথি বিনা বাক্যে ইফতার শুরু করল। হযরত অত্যন্ত রুষ্ঠ হয়ে তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন।

অতিথি বললো-

"কহিল অতিথি মানি না ও রীতি
আগে তা বাঁচাই প্রাণ,
অগ্নিরে পূজি মানিনাক আমি
আর কোনো ভগবান।
দৈব বাণীতে হইল ধ্বনিত
কি করিলি মূঢ় হায়,
আমি তো তাহারে সহিয়া এসেছি
আশিটি বছর প্রায়।
অন্ন দিয়াছি দুনিয়ায় মোর
করিতে দিয়াছি বাস,
একদিনও তারে সহিতে নারিলি
কাড়িলি মুখের গ্রাস।

কাফের? সেও তো মোরি সন্তান
দেখিলি না হায় বুঝে,
হুতাশনে যেবা উপাসনা করে
সেওতো আমারে পূজে॥"

তাই বলতে বাধা নেই, সূর্য, অগ্নি ইত্যাদি পূজা হযরত ইব্রাহীমের অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। হযরত ইব্রাহীম এই সব পূজা-প্রথার অসারতা প্রতিপন্ন করে তার বিরুদ্ধে নিরাকার একেশ্বর পূজার দিকে মানব জাতিকে আহবান করেন। কুরআনের বিবিধ সুরায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ মেলে। হযরত ইব্রাহীম ছিলেন বর্তমান ইরাকের "উর' গ্রামের বাসিন্দা। তিনি পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। প্রাচীন ভারতবর্ষেও তাঁর ধর্মীয় প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে, হযরত ইদ্রীস জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার যে ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁর অনুসারিগণ তা বহু দেশেই বিস্তৃত করেছিল। হযরত ইব্রাহীম এসেছিলেন এদের পরে।

আমরা জানি, তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা আজর ছিলেন মূর্তি নির্মাতা ও মূর্তি-পূজক। ইব্রাহীম এই মূর্তি-পূজার শুধু বিরোধিতাই করেননি, স্বহস্তে মূর্তি ভগ্ন করে 'মূর্তি ভগ্নকারী' ইব্রাহীম নামে পরিচিত হয়েছিলেন। উপরিউক্ত কাব্য-বিবরণীর সাক্ষ্যে বলা যেতে পারে যে, তিনি সাবেয়ীদের ভ্রান্ত মতবাদ নিরসনের জন্যও প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর ধর্মমত ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। তাঁর পুত্রগণের ধর্মমত (য়িহুদী-খ্রীস্টান) বৃহত্তর ভারতবর্ষেও বিস্তার লাভ করেছিল বললে শুধু ভুল হবে, বৃহত্তর ভারতবর্ষে ইব্রাহীমের ধর্মমতই প্রধান হয়ে উঠেছিল। আধুনিক গবেষণার ফলে জানা যাচ্ছে, ভারতীয় আর্য তথা হিন্দু ধর্মও মূলত ইব্রাহীমের ধর্ম (সনাতন ধর্ম) রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পবিত্র কুরআনেও সাক্ষ্য দিচ্ছে, হযরত ইব্রাহীমের প্রধান দুই পুত্র ইসমাইল ও ইসহাকের বংশধরদের ধর্মমতই পরবর্তীকালে য়িহুদী, খ্রীস্টান, এমনকি মুহম্মদীয় ইসলাম ধর্ম নামে প্রচলিত হয়। এখনও এই ধর্ম মত বিভিন্ন নামে প্রচলিত রয়েছে। এদের মধ্যে হয়রত ইসমাইলের বংশেই ইসলামের সর্বশেষ নবী হযরত মুহম্মদের আবির্ভাব ঘটে। হযরত ইসহাকের বংশের শেষ নবী হযরত ঈসা (আঃ)। শুধু তাই নয়, আল কুরআনে হযরত মুহম্মদকে সাবধান করে বলা হয়েছে, তিনি যেন হযরত ইব্রাহীমের পুত্র হযরত ইসহাকের বংশধরের ধর্ম, যা য়িহুদী- খ্রীস্টান ধর্ম নামে প্রচারিত হয়েছিল, থেকে সাবধান হন, এবং হযরত ইব্রাহীম প্রতিষ্ঠিত মূল ধর্ম ইসলামের পথেই পরিচালিত হন। এখানেও প্রসঙ্গক্রমে সাবেয়ীদের তথা প্রকৃতি ইত্যাদি পূজকদের বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, হযরত মুহম্মদের

আবির্ভাব ঘটে এই বংশেই এবং আরব দেশের মক্কা নগরীতে।

আরও কৌতুহলের ব্যাপার, ইসলাম ধর্মীয় শেষ নবী হলেও তিনি জন্মেছিলেন এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ তথা পৌত্তলিক বংশে।

হযরত ইব্রাহীমের মতই তিনি তাঁর পিতৃ-পিতামহ পূজিত দেব-দেবী মূর্তি ধ্বংস করে সত্য ও সনাতন (ইসলাম) ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু ধর্মের শেষ অবতার কল্কীরও জন্মস্থান ছিল এক মরুময় দ্বীপে, তার নাম 'সম্ভল'/ শান্তি-দ্বীপ (আ. বালাদুল আমিন)।

কথিত আছে কল্কী ম্লেচ্ছ/ কাফিরদের দমন ক'রে সত্য ও সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন।

আরও উল্লেখ্য, কল্কীদের বিষ্ণু-যশাঃ নামক এক ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁর মাতার নাম হল 'সুমতি'। কৌতুহলের ব্যাপার, এই 'বিষ্ণু যশাঃ' ও 'সুমতি' যথাক্রমে আরবী ভাষায় আব্দুল্লাহ ও আমিনা নামের সমতালীয়।

আর কল্কী প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্মও কোনো আঞ্চলিক বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা 'ব্রহ্মা'ও আরবী ইব্রাহীম নামের সমতালীয়, (যথা-বৈ-ব্রহ্মা> পা. বারহামা> ই. আবরাহাম>আ. ইব্রাহীম) ব্রহ্মা শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কেও বলা যায়, ল্যাটিন -ফ্লম্স> ফ্লেম/ Flame =ব্রহ্ম = অগ্নি/ অগ্নিদেবতা। এই দিক দিয়েও ব্রহ্মাকে হিন্দু মতে, আদি-দেবতা/ সৃষ্টিকর্তা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন অগ্নি-বিজয়ী এবং গোত্র- প্রধান। আল কুরআনে বলা হয়েছে- 'আবীকুম'/ গোত্র প্রধান- মানব জাতির (সনাতন ধর্মাবলম্বীর) আদি পিতা।

বিশ্ব ধর্ম সম্প্রদায়সমূহের ক্রম হিসাবে লক্ষ্য করলেও দেখা যায়, আদি পিতা হযরত আদমের বংশে হযরত ইদ্রীস, হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীমের আবির্ভাব। কালের দিক দিয়ে হযরত ইব্রাহীম বর্তমান মানব-জাতির আদি- পিতা। এর পরে একে একে আসে য়িহুদী, খ্রীস্টান ও মুহম্মদীয়/ নবায়িত, ইসলাম; হিন্দু মতে, বলা যায়, সনাতন ধর্ম। মাঝখানে সাবেয়ীন নামে যে সব ধর্ম সম্প্রদায়ের কথা আছে, তারা হল তথাকথিত প্রকৃতি-পূজক, মূর্তি-পূজক নামধারী জড়োপাসক। এদের মধ্যে পৌত্তলিক হিন্দু, অগ্নিপূজক পারসিক ইত্যাদি পড়ে।

অবশ্য মূল ধর্ম বলতে গেলে এরা কোনো বিশেষ ধর্মের মধ্যে পড়ে না। মূল ধর্মের বিকৃতিতে এদের জন্ম। বর্তমান গ্রন্থে এদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

॥ চার ॥

# রাম জন্মভূমি ঃ

## ভারতীয় অযোদ্যায় না থাইল্যাণ্ডে?

'মুক্তিবাণী' পত্রিকায় "রামের জন্মভূমি থাইল্যাণ্ডের অযোধ্যায়" শীর্ষক ছোট্ট লেখাটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। পক্ষান্তরে ভারতীয় হিন্দুগণ মনে করেন, রামচন্দ্র ভারতীয় অযোধ্যা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অথচ কৌতূহলের বিষয়, রামচন্দ্রকে তাঁরা স্বয়ং ভগবান/ ভগবানের অবতার বলে মনে করেন।

ভগবান আর অবতার একার্থক নয়। অবতার হলেন তিনি যাকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন, এবং সকল জাতিই বিশ্বাস করেন যুগে যুগে দেশে দেশে স্রষ্টা/ আল্লাহর দূত, তাদের যে নামেই ডাকা হোক, ভ্রমপ্রবণ মানুষের কাছে প্রেরিত হন। এটি সকল শাস্ত্রেরও কথা।

তাই হিন্দুদের এই রাম নামক ভগবান যদি অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এখন সেই অযোধ্যা কোথায়? অবশ্য রামকে যদি স্বয়ং ভগবান বা স্রষ্টা মনে করা হয় তাহলে তো তাঁর জন্মস্থানের কথা অবান্তর হয়ে পড়ে। কারণ, ভগবানের জন্মগ্রহণ বা কোনো নশ্বর মানুষের সন্তান হয়ে বিশেষ স্থানে জন্মগ্রহণ করার কথা নিতান্তই উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত।

পবিত্র আল কুরআনে স্পষ্টই বলা হয়েছে, 'লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ'। মানে, তিনি কোনো সন্তান, যেমন-মানুষের সন্তান হয়, পয়দা করেননি, এবং তিনিও কারও সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেননি। তাই অযোধ্যায় ভগবানের জন্মস্থান প্রসঙ্গটি নিতান্তই উদ্ভট কল্পনার বিষয়। অবশ্য ভারতীয় জননেতা স্বর্গীয় মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী যে অযোধ্যায় রামচন্দ্রের আগমনের কথা বলেছেন, তার মধ্যে একই মানসিকতা কার্যকরী হয়েছে। যেমন, তিনি তাঁর বিখ্যাত 'রামধুন' সঙ্গীতে লিখেছেন, "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম/ পতিত পাবন সীতারাম/ ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম/ সবকো সুমতি দে ভগবান।"

এখানে একাধারে 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' ও 'পতিত পাবন সীতারাম' কখনও এক হতে পারেন না। কারণ, রঘু বংশের ছেলে 'রাজা রাম' এবং পতিত উদ্ধারকারী সীতারাম, যাকে পরে আবার 'ঈশ্বর আল্লাহ' বলা হয়েছে; এক বক্তি কিভাবে হতে পারে? ঈশ্বর শব্দের অর্থ যাই হোক, আল্লাহ মুসলমানদের বিশ্বাস মতে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং একাধারে সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়কর্তাও তিনি। তাঁর

মূলগত অর্থও হল 'আল-এলাহ' মানে, একমাত্র উপাস্য। ইসলামে দুই বা ততোধিক আল্লাহর কল্পনার প্রশ্নই ওঠে না। কেউ কেউ আবার রাম ও রহিমকে জুদা না করতে বলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন। কিন্তু হিন্দুর রাম যদি ব্যক্তি হন তিনি রহীম/আল্লাহর সমকক্ষ হবেন কি করে? অবশ্য রামকে পরম সত্ত্বা স্রষ্টা অর্থে ধরা হলে কোন কথা হয় না। কিন্তু মুসলমানদের কাছে 'রহীম' আল্লাহ শব্দেরই নামান্তর। ইসলামে আল্লাহর ৯৯টি গুণ নাম/ আসমাউল হুসনা, পবিত্র নামসমূহের উল্লেখ আছে। এই নাম কিন্তু কোনো অংশীবাদী বিশ্বাসের নাম নয়। তাই রাজা রামের সঙ্গে রহীমের নয়- আব্দুর রহীমের/ আল্লাহর বান্দার প্রসঙ্গ আসতে পারে। সে কথা থাক, আমরা এখন মূল বিষয়ে আসি। হিন্দু শাস্ত্রে (সংস্কৃত রামায়ণে) যে রামের কাহিনী বিবৃত হয়েছে, তিনি 'নরোত্তম' রাম নামে কথিত হয়েছেন। এবং নরোত্তম রামের উপর যে সব গুণাবলী আরোপিত হয়েছে, তা নিতান্তই মানবীয়। যেমন, রামচন্দ্র পিতৃ-মাতৃ বৎসল, ভক্ত-বৎসল, স্ত্রী, ভ্রাতার প্রতিও তাঁর অপূর্ব প্রেম ও করুণার পরিচয় দেয়া হয়েছে রামায়ণে। অর্থাৎ যতগুণে মানুষকে ভূষিত করা যায়, রামায়ন কাহিনীতে রামচন্দ্রকে তার সকল গুণেরই আধার করা হয়েছে। তাই বলতে বাধা নেই, এই রাম মানুষ না হয়ে যান না। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা প্রয়োজন, এই রামায়ণ রচনাকালে দেবর্ষি নারদ বাল্মীকিকে রামায়ন রচনার নির্দেশ দিলে তিনি অকপটে জানিয়েছিলেন যে, তিনি রামের সম্পর্কে তো কিছুই জানেন না, এমনকি রাম নামও কোনদিন শুনেননি। মহর্ষি তাঁকে রাম নাম শুনালেন এবং সেই রামের কাহিনী লেখালেন। এই যদি রামের কাহিনী হয়, তা হলে তার কোথায়ই বা বাড়ি, আর কোথায়ই বা ঠিকানা? বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথও তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় তাই যথার্থই বলেছেন,

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে।
কবি তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান
অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো"

তাই যদি হয়, তবে রামের জন্মস্থান নিয়ে মারামারি ঝগড়াঝাটি কিসের? আমাদের বর্তমান লেখক একজন বিখ্যাত ভ্রমণকারী পণ্ডিত রায় শঙ্করের সফরনামার বরাত দিয়ে থাইল্যান্ডস্থ অযোধ্যায় যে রামচন্দ্রের কথা বলেছেন, হতে পারে তিনি অন্য রামচন্দ্র। থাইল্যান্ডের প্রাচীন নাম শ্যাম দেশ। এমনকি এমনও হতে পারে যে, কবি বাল্মীকি উক্ত শ্যামদেশের (থাইল্যান্ডের) বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু বাল্মীকির বাক্যই প্রমাণ দিচ্ছে তিনি যে রামচন্দ্রের কথা বলেছেন, তা তাঁর কবি-কল্পনার সামগ্রী। তবে তাঁর কাব্যের পটভূমি ছিল তাঁর স্বদেশ। শুধু শ্যামদেশ

কেন, শ্যাম, কম্বোজ, বালি সুমাত্রা ইত্যাদি সাগরকূলের দেশগুলোতেও রামায়ন-মহাভারত কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয়। শুধু একালে নয়, অতি প্রচীনকাল থেকেই তাঁর জনপ্রিয়তা আছে। ভ্রমণকারী রায়শঙ্কর বলেছেন, থাইল্যান্ডে অবস্থিত 'অযোধ্যা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি'কে থাইল্যান্ডের জাতীয় কোম্পানীরূপে দেখে এবং রামায়ন কাহিনীর বাস্তব পটভূমি ভেবে তিনি 'হতভম্ব' হয়ে গিয়েছিলেন। এটি নিতান্তই স্বাভাবিক। ভারতীয় হিন্দুদের প্রাচীন তীর্থ হিসেবে 'শ্যাম-কম্বোজ' অতি প্রসিদ্ধ। বিশেষ করে এখানেই আদি দেবতা (দেবাদিদেব মহাদেব) শিবের আদি তীর্থ ওঙ্কারধামও অবস্থিত।

বিখ্যাত নদী গোদাবরী তীরেই এই ওঙ্কারধাম অবস্থিত। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আমরা বাঙালী'তে এই ওঙ্কারধাম সম্পর্কে বলেছেন- "শ্যাম-কম্বোজে ওঙ্কারধাম মোদেরি প্রাচীন কীর্তি।" বিখ্যাত হিন্দুতীর্থ 'বরভূধর'ও এখানেই অবস্থিত। কম্বোজ হল কম্বোডিয়া/ বর্তমান নাম কম্পুচিয়া। রামায়ণে বর্ণিত গোদাবরী নদী এখানেই অবস্থিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাই, সীতাহারা রামচন্দ্র এই গোদাবরী তীরেই সীতার জন্য বিলাপ করেন-

"বিলাপ করেন রাম লক্ষণের আগে
ভূলিতে না পার সীতা সদা মনে জাগে
কি করিব কোথা যাবো, অনুজ লক্ষ্মণ
কোথা গেলে সীতা পাবো, কর নিরূপণ।
গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন,
তথা কি কমলমুখি করেন ভ্রমণ
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন।"

কৌতূহলের ব্যাপার, পন্ডিত রায়শঙ্কর লিখেছেন, রামচন্দ্র যেখানে বনবাস কাল যাপন করছিলেন সেটি নাকি বর্তমানে মালয়েশিয়ার অন্তর্গত। এবং মালয়েশিয়াতে লঙ্কা নামক এক প্রাচীন দ্বীপও আছে। তবে কি লঙ্কারাজ রাবণ এই লঙ্কা দ্বীপের অধিপতি ছিলেন? এখন এই দুই লঙ্কা কি একই?

কৌতুহলের ব্যাপার, মুসলিম পুরাণ কাহিনীতে লঙ্কাদ্বীপে (সরন্দীপ) আদি পিতা হযরত আদমের (আঃ) আদিনিবাস কল্পনা করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় লঙ্কা (বর্তমানে শ্রীলংকা) দ্বীপেও আদমের স্মৃতিচিহ্ন (Adam's Peak) আছে বলেও মনে করা হয়। খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীরাও এরূপ দাবি করে থাকেন। শ্যাম-কম্বোজ ওঙ্কারধামের অস্তিত্ব থেকে অনুমান করা যেতে পারে, স্থানটি শুধু ভারতীয় হিন্দুদের

কেন, মানব জাতিরই আদি তীর্থস্থান। কারণ, ওঙ্কার ধ্বনির মূলে যে তিনজন আদি দেবতার (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর/ শিবের) আবির্ভাব কল্পনা করা হয়েছে, তারই সম্মিলিত নামই হল ওঁ/ওঙ্কার ধ্বনি। ধ্বনিটি হিন্দুদের সামবেদ থেকে গৃহীত। তাই শুধু আদি দেবতা শিব কেন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরও আদি স্থান সে এলাকা। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কাব্য রামাঈ পন্ডিতের শূন্য পূরাণে আদি দেবতা শিবকে হযরত আদম ও চন্ডীকে বলা হয়েছে হায়া (হাওয়া)। 'আপুনি চন্ডিকা দেবী তিহঁ হৈল হায়া বিবি' ইত্যাদি। আর 'আদক্ষ হৈল শূল পানি'। সাম্প্রতিক তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র আলোচনা থেকেই জানা গেছে, এই দেবতাত্রয় আসলে শ্রীভগবানের অবতার, মানে, শ্রীভগবানের মূর্তিমান রূপ নয়, তাঁর বিশেষ অবতার/ দূতের সম্মিলিত নামরূপ, যাঁরা যুগে যুগে দেশে দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তুং রবীন্দ্রনাথের "ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন এ সংসারে"

এদের মধ্যে শিবকে আদি পিতা আদমের সঙ্গে এক করে দেখা যেতে পারে। ব্রহ্মা সম্ভবতঃ হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) নামান্তর। আল-কুরআনে হযরত ইব্রাহীমকে আদি পিতা (আবীকুম), মানে, সমকালীন গোত্রপতি বলা হয়েছে। এঁরই বংশে শেষ নবী হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাব হয়। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে ইব্রাহীম শব্দের ব্যুৎপত্তি এরূপ হতে পারে- ইব্রাহীম (আব্রাহাম) (Abraham) বারহামা (পাহলবী ভাষায়) ব্রহ্মা (সংস্কৃত)।

আল কুরআনেই পাই, হযরত ইব্রাহীমের বংশধরগণই পরবর্তীকালে মূল একেশ্বরবাদ ভুলে পৌত্তলিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে। তাদের নাম যথাক্রমে য়িহুদী ও খ্রীষ্টান। কিন্তু হযরত ইব্রাহীমের ধর্ম ছিল তা থেকে মুক্ত, মানে তিনি তৌহীদ/ একেশ্বরবাদী ছিলেন। আল কুরআনে এ কথা বলে শেষ নবী মুহম্মদকে (সঃ) আদি পিতা হযরত ইব্রাহীমের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে (আবীকুম)। তাহলে দেখা যাচ্ছে, হযরত ইব্রাহীম একেশ্বরবাদী ছিলেন। কিন্তু হিন্দু-বিশ্বাসের ব্রহ্মা কি তাই ছিলেন? বড় কঠিন প্রশ্ন। ব্রহ্মার প্রশ্ন এখানে মুলতবী রেখে ইব্রাহীমের প্রসঙ্গে আসা যাক। কুরআন-বাইবেল মতে, ইব্রাহীমের পিতা আজর ছিলেন মূর্তিনির্মাতা ও মূর্তিপূজক। পুত্র ইব্রাহীম কাবাগৃহে প্রতিষ্ঠিত এই মূর্তিগুলো (যার সংখ্যা ছিল ৩৬০) ধ্বংস করে তৌহীদ বা একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। যার অভিনব নাম হয় ইসলাম এবং তাঁর সম্প্রদায় 'মিল্লাতে ইব্রাহীম' নামে পরিচিত হন। এঁদেরই পরিণতিতে য়িহুদী-খ্রীষ্টান এবং সকলের শেষে ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এরই পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহম্মদ (সঃ)। ইসলাম মতে, তিনিই শেষ নবী/ অবতার।

কৌতুহলের ব্যাপার, এই ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকালে তাঁকেও পবিত্র কাবা ভূমি থেকে পুণরায় ৩৬০টি প্রতিমূর্তি নিরসন করে সত্য ধর্মের (সনাতন ধর্মের) পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হয়। ইব্রাহীম প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্মে এই মূর্তিপূজার প্রবর্তন করেছিলেন কারা এবং কেন করেছিলেন? এ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, আল কুরআনই বলেছে, পৃথিবীতে যত নবী/রছুলই এসেছেন, তাঁরা সত্য এবং সনাতন ধর্মই প্রচার করেছেন এবং এই সনাতন ধর্মই ইসলাম। যার সূত্রপাত হয় আদি পিতা আদম থেকে। তবে তাদের উত্তরাধিকারীরা সত্য পথ বিচ্যুত হয়ে যুগে যুগে মানব-জাতিকে নানা বিভ্রান্তিতে পতিত করেছে। সর্বশেষ নবী রসুলুল্লাহ শেষবারের মত বিশ্ববাসীকে স্থায়ীভাবে সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠার বাণী পেশ করেছেন এবং সেই পথই চিরন্তন মানব জাতির জন্য অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু তিনি করেছেন কী? ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পূর্বতন সকল নবী/ অবতারদের পথ ধরেই তিনি সত্য ও সনাতন ধর্মের দিশা দেখিয়েছেন।

তিনি কোন নতুন ধর্মের অনুসরণ করেননি। হিন্দু পুরাণে (কল্কীপুরাণ) এমনকি মহাভারতেরও কল্কীদেবের যে পরিচয় প্রদর্শিত হয়েছে, তার সঙ্গে শেষ নবী রসুলুল্লাহর জীবন ও ধর্ম সংস্কারের মিল আছে। উপরে যে ব্রহ্মার কথা বলা হয়েছে, তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আদি দেবতা, যার মুখ থেকে ব্রাহ্মণদের জন্মের কথা বলা হয়, তাঁকে ব্রহ্মা/ সৃষ্টিকর্তা না বলে যদি আদি মানব বলা হয়, তা হলে পূর্ব ধর্মসমুহের অনুশাসন থেকে (ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গ্রন্থ আদি বেদ ঋক/ ঋগ্‌বেদ) আলাদা মনে হয় না।ঋগ্‌বেদের সংকলয়িতা ব্রহ্মা (বারহামা> আব্রাহাম> ইব্রাহীমকে একই ব্যক্তি বলা হয়।

সম্প্রতি ব্রহ্মা শব্দের একটি ব্যুৎপত্তির সন্ধান মিলেছে। তা হলে -ল্যাটিন flamma (ফ্লাম্ম) থেকে ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি হতে পারে। ফ্লাম্ম থেকে flame/ অগ্নি ব্যুৎপন্ন। ব্রহ্মা তাই 'অগ্নি দেবতা'। আল কুরআনে পাই- হযরত ইব্রাহীমকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তিনি আগুন থেকে রক্ষা পান। তাই কি তিনি 'অগ্নিদেবতা' হয়েছেন?

বাইবেল- কুরআনেও আব্রাহাম ও ইব্রাহীমকে একই বলা হয়েছে। আরও উল্লেখ, হযরত ইব্রাহীমের দুই পুত্র ইসমাইল ও ইসহাকের বংশেই পরবর্তী নবীদের আবির্ভাব হওয়ার কথাও বলা হয়েছে। তন্মধ্যে ইসমাইলের বংশে একমাত্র শেষ নবী হযরত রসূলুল্লাহর আবির্ভাবের কথাও ইতিহাস মোতাবেক সনাক্ত করা যায়। হযরত ইব্রাহীমের পুত্র ইসমাইলের কুরবানীর কথাও সর্বজন বিদিত। তার বংশধরের কুলজী/ কুরসী থেকে এই বংশের ধারা বর্তমান অবধি মিলে। অর্থাৎ ইব্রাহীম থেকে হযরত মুহম্মদ (সঃ) এবং মুহম্মদ থেকে বর্তমান কালতক

বংশ-লতিকা/ কুরসীনামা বর্তমান। এবার রামচন্দ্র প্রসঙ্গে আবার আসা যাক।

হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে ভারত উপমহাদেশের দশজন অবতার/ নবীর আগমন কাহিনী পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন যথাক্রমে মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, পরশুরাম, রাম (রঘুপতি), বামন, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি।

এঁরা চার যুগের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন- এই যুগ হল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। কল্কি হলেন সকলের শেষ অবতার। কলি যুগই শেষ যুগ।

তাই কল্কি ও হযরত মুহম্মদ শেষ অবতার ও নবী হওয়া সম্ভব। তাহলে রামচন্দ্র কি নবী? নবী রামচন্দ্র কিনা, সঠিকভাবে নির্দেশ করা যাবে না, তবে তাঁকে একেবারে অস্বীকারও করা যাবে না। তাঁর আবির্ভাব কাল ভারতীয় আর্যদের ভারতে আগমন কালের গোড়ার দিকে। রামায়ণে তাঁর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, মোহেনজোদাড়ো ও হরাপ্পার প্রাচীন সভ্যতা এঁরই হাতে বিনষ্ট হয়ে নতুন ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্য সভ্যতা গড়ে ওঠে। ব্রাহ্মণগণ তাঁকে প্রথমে শ্রেষ্ঠ নেতা/ বিজয়ী রূপে বরণ করে নেয়, পরে তিনি দেবতা হয়ে ওঠেন। পরাজিত অনার্যগণ (দ্রাবিড় জাতি) বিতাড়িত হয়ে পাহাড়-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে কোনোমতে জীবন রক্ষা করে। অনুমতি হয় এদেরই নেতা রাবণ-মেঘনাদ অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়াস পান, কিন্তু পরিণামে পরাজিত ও বিতাড়িত হন। রামায়নে আছে, রাবণ-ভ্রাতা বিভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুপক্ষে (রামের পক্ষে) অস্ত্রধারণ করে এবং সুগ্রীব প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণ রামের পক্ষ অবলম্বন করে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস বিজয়ী রামচন্দ্র তাদের দেহরক্ষী ও দাসের অধিক মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

আজ তাদের বংশধরেরা জল অনাচরণীয় হয়ে আছে। কৌতুহলের ব্যাপার, বিশাল ভারতবর্ষে আজও তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলা যায়। সত্যযুগে ব্রহ্ম প্রভৃতি, ত্রেতা যুগে রঘুপতি রাম, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ এবং সর্বশেষে কলিতে কল্কির আবির্ভাব হয়। কুরআনে রামচন্দ্রের নাম না থাকলেও, বাইবেলে এক রামের নাম পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর 'কাহেন'। হাদিসে এই নামে একজন নবীর আভাস দিয়েছেন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)। কল্কির কাহিনী আগে বলা হয়েছে। বলাবাহুল্য, সম্প্রতি সাগর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, ভারতের সাগরগর্ভ থেকে দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ রাজা/ অবতারের স্মৃতিসূচক দ্বারকা রাজ্যের বহু ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেছেন। আর পূর্বতন কাহিনী প্রাচীন মোহেনজোদাড়ো ও হরোপ্পার ধ্বংসবাশেষ লক্ষ্য করা গেছে।

এই শহর দু'টি আবিষ্কারের পর ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল প্রাচীন অধ্যায় আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেছেন- প্রাচীন রামায়ণে রামচন্দ্র ও মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের কর্মবহুল জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান দ্বীপময় ভারত সম্ভবতঃ এঁদেরই আদি বাসস্থান ছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই আর্য বিজয়ের গৌরবময় চিত্র তাঁর অমর কাব্যে রূপায়িত করেছেন। যেমন তাঁর 'সাগরিকা' ও অন্যান্য দ্বীপময় ভারত সম্পর্কিত কবিতায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। একটু নমুনা দেওয়া যাক- প্রথমেই বালি দ্বীপের বর্ণনাঃ

"সাগর জলে ছিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল উপকূলে।
শিথিল পিতবাস
জলের উপর কুটিল রেখা
লুটিল দুই পাশ ইত্যাদি।"

এর পরেই এলেন আর্য পুত্র (রামচন্দ্র) তার দিগ্‌বিজয়ী বাহিনী নিয়ে-

"মকর চূড় মুকুটখানি পরি ললাট পরে
ধনুক বাণ ধরি দখিন করে
দাঁড়ানু রাজবেশী।
কহিনু আমি এসেছি পরদেশী।
চমকি ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি
শিলা আসন ফেলে
সুধালে কেন এলে?
কহিনু আমি রেখো না ভয় মনে
পুজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে।
তুলিনু যুথি তুলিনু জাতি তুলিনু চাঁপা ফুল
দু'জনে মিলি সাজায়ে ডালি বসিনু একাসনে
নট-রাজেরে পুজিনু এক মনে।"

উল্লেখ্য, এখানে নটরাজ শিব উপাস্য দেবতা। কবির কাছে জীবশক্তি ও শিবশক্তি একাকার হয়ে গেছে।

তুং বাঙালি শাক্ত কবির বাণীঃ

'ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবরাম
সকল আমার এলোকেশী"

অথবা,

"জানো নারে মন পরম কারণ
কালী কেবল মেয়ে নয়
সে যে মেঘেরই বরণ করিয়ে ধারণ
কখনও কখনও পুরুষ হয়।"
তুং 'লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ'।
-আল কুরআন।

এভাবে এক ও অনন্য স্রষ্টা পৌত্তলিক ভারতবর্ষে এসে বহুরুপে, কখনও পিতা, কখনও মাতারূপে, কল্পিত হয়েছেন ও পূজা পেয়েছেন। রামচন্দ্রও এমনি একজন পূজ্য দেবতারূপে পূজিত হয়েছেন। ইসলাম দুনিয়ার মানুষের কাছে যে পরম সত্যটি তুলে ধরতে চেয়েছে, সে হল সৃষ্টি ও স্রষ্টার একত্ব ও মানবীয় সাম্য ও প্রেম। পবিত্র আল কুরআন- এর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-

"ওয়াইল্লা হাযিহি উম্মতাকুম উম্মতা/ ওয়াহিদাতান ওয়া আণ্যা রাব্বুকুম ফাত্তাকুন।"

মানে,

নিশ্চয়ই মানবজাতি এক ও অভিন্ন এবং আমি (আল্লাহ) তোমাদের সকলেরই প্রভু (রাব) ব্যতীত নই। আল্লাহ আমাদের এই মূল সত্য উপলব্ধির তৌফিক দিন। আমিন।"

॥ পাঁচ ॥

## সাংস্কৃতিকী

### 'God'—'যেহোবা' ঈশ্বর-আল্লাহ (বিসমিল্লাহ)

সকল প্রাচীন শাস্ত্রেই কিছু কিছু জটিল ও দুর্বোধ্য হরফ আছে। যেমন, মহাভারতে 'ব্যাসকুট', আল কুরআনে 'হরুফ-উল মুকাত্তয়াত'/ বিতর্কিত হরফ।

শাস্ত্রবেত্তাগণ সহজে যার অর্যোধ্যার করতে পারেন না, বা করতে মানা (ইং Taboo)। তাই অর্থ নিয়ে ঝগড়া বাধে। আর্য ভাষায় আর্যপুত্র 'রাম', এবং য়িহুদী বাইবেলে 'যেহোবা' এমনি একটি নাম। 'যেহোবা' (আঃ ইয়াহুয়া) এবং আর্য ভাষায় 'রাম' নাম সম্ভবতঃ একই নামের বিবর্তন। অর্থ-হাঁস সে/ তিনি। হিব্রুতে ইয়াহুয়া (Yoth Hu wav Hua) এবং আরবীতে ইয়াহুয়া (YHWH) একই অর্থে

ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আসলে এই 'ইয়াহুয়া'/ যেহোবা বলতে কি বুঝায়? কে সে?

বাইবেলে 'যেহোরার' পাশাপাশি 'ইলোহিম' (Elohim) শব্দও ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে বাইবেলে (Genosis) 'যেহোবা' ব্যবহৃত হয়েছে ৬৮২৩ বার, পাশাপাশি 'ইলোহিম' (Elohim) ব্যবহৃত হয়েছে ১৪৬ বার। খ্রীস্টান বাইবেলে এর অর্থ করা হয়েছে 'Lord God' / সদাপ্রভু (দ্রঃ The Choice, London, ১৮৯৩, পৃ. ২৪৯-৫৩.)

এভাবে স্রষ্টার প্রকৃত পরিচয় গোপন রেখে মানব মনের বিভ্রান্তি বেড়েই চলেছে। বলা হয়েছে, ইংরাজি বাইবেলে এ দুটি একত্রে বলা হয়েছে 'Lord God' / সম্মানিত মহাপ্রভূ (আল্লাহু তায়ালা)। পক্ষান্তরে, য়িহুদী ধর্মযাজকগণ (Rabbis) শব্দটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন (Taboo)। মুখে উচ্চারণ করলে ছিল মৃত্যুদন্ড। রাম নামেও তাই। কিন্তু ব্যাপারটি কি? জানা যায়, খ্রীস্টীয় ষোল শতক পর্যন্ত য়িহুদীদের মধ্যে God নামোচ্চারণ নিষিদ্ধ ছিল। সম্ভবতঃ সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল হওয়ার আগে পর্যন্ত নামটি সর্ব সাধারণের বোধগম্য ছিল না। কিন্তু আসলে ব্যাপারটি কি? কে সে? পরবর্তীকালে ভাষা তত্ত্ববিদগণ কুরআনে বিসমিল্লাহ/ আল্লাহ শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখেন যে, কুরআনের বহু স্থানে (যেমন, ক্বুল হুয়াল্লাহু আহাদ/ বল, তিনি আল্লাহ এক ও অদ্বৈত)। আল্লাহ শব্দটি এক ও অদ্বৈত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যেহোবা তারই নামান্তর। ব্যুৎপত্তিগত অর্থের যেহোবা আরবী ইয়াহুয়া থেকে ব্যুৎপন্ন। কৌতুহলের ব্যাপার, ভারতে আর্যপুত্র রাম ও ভগবান নামে কথিত হন। মানে, রামায়নে বর্ণিত 'নরোত্তম' রাম, ভগবান সেজে বসলেন। রাম নামও হল নিষিদ্ধ।

বিশেষ করে নারী ও শূদ্র জাতির জন্য এ নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ হল। বলা হয়েছে, য়িহুদী বাইবেলেও ইতিপূর্বে 'যেহোবা' নাম চালু হয়েছিল। অর্থ একই, পরিণামও একই। বাল্মিকী রামায়নে দেখা যায় রাম গান করার অপরাধে 'শম্বুক' শূদ্রকে রামচন্দ্র স্বয়ং হত্যা করে সাধনার সিদ্ধি লাভ করেন। যার ফলে মৃত ব্রাহ্মণ পুত্র মৃত্যু থেকে পুনরুজ্জীবিত হল এবং সম্বুক 'নাম' সাধনায় ব্যর্থ হল।

কিন্তু কৌতুহলের ব্যাপার, এহেন রামচন্দ্র আবার এই প্রদত্ত দেবত্ব অস্বীকার করে বসলেন। স্বীয় সতী সাধ্বী স্ত্রী সীতাকে নিজ অংশে উদ্ভূত (শক্তি) হিসেবে গ্রহণ করতে না-রাজ হলেন। ফলে অগ্নি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার পরে তিনি রামচন্দ্রের সংশ্রব ত্যাগ করে মনের দুঃখে পাতাল প্রবেশ করলেন। মা বসুধা এই

মহা সতী সাধ্বী নারীকে আপন কোলে আশ্রয় দিলেন। পক্ষান্তরে সীতা-সতীর বদলে বাধ্য হয়ে রামচন্দ্রকে স্বর্গ সীতাকে শক্তি হিসেবে রাজ সিংহাসনে স্থান দিতে হল। ফলে, রামচন্দ্র সাধারণ মানুষ থেকেও নেমে এলেন এবং সীতা হলেন সতী শিরোমনি। সম্ভবতঃ এই অস্বীকৃতির কারণে মাতৃজাতির প্রতি শ্রীরামের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হল এবং সেই সঙ্গে অনভিজাত অস্পৃশ্য শূদ্র জাতির জন্যও রাম-নাম জপনা (উচ্চারণ) নিষিদ্ধ হয়ে গেল (Taboo)। শম্বুকের হত্যা তারই ফল। মধ্যযুগের বাঙালী কবির মুখেও তাই শোনা গেল-

'জাতি যার প্রভু যদি করি নাম গান'।

তুলনীয় মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের উক্তি-

" বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি
বুঝহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।"

পরবর্তী (অন্নদা মঙ্গল)

কৌতূহলের ব্যাপার, হিন্দু ধর্ম পুনরুত্থান যুগে এই রাম নামের মাহাত্ম্য বেড়ে গেল।

"একবার রাম নামে যত পাপ হবে,
মানবের সাধ্য কি যে তত পাপ করে।"

অথবা "রাম-রহীম না জুদা কর ভাই, দিলকো সাটকা রাখেজি।"

পক্ষান্তরে, ইসলামে মানব জাতিকে এক ও অদ্বৈত মানব জাতি এবং আল্লাহকে সর্বশক্তিমান এক ও নিরাকার মহাপ্রভু বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

যথা-

"ইন্না হাজিহি উম্মতান ওয়াহিদাতান ওয়া
আনা রব্বুকুম ফাত্তাকুন। -কুরআন।

অর্থাৎ নিশ্চিয়ই মানুষ জাতি এক ও অদ্বৈত এবং আমি (আল্লাহ) তোমাদের অদ্বৈত রব/ প্রভু ব্যতীত নই। এই নাম সর্বজনীনভাবে চালু হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণ্যবাদিগণ নিজেদেরকেই ঈশ্বর বলে দাবি করে বসলেন। (তুং অহং ব্রহ্মষি/ আনাল হক) এই মন্ত্রের জন্ম হল।

মূল বেদে কেন, কোন শাস্ত্র গ্রন্থেই এরূপ কথা নেই। উল্লেখ্য, মূল বাইবেল গ্রন্থেও মহাত্মা যিশুকে খোদার পুত্র বা স্বয়ং খোদা বলা হয়নি। শুধু তাই নয়, সকল

শাস্ত্র গ্রন্থেই মানব জাতিকে এক ও অদ্বৈত জাতি এবং তার স্রষ্টাকেও এক ও অদ্বৈত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনে আছে তার পূর্ণ স্বীকৃতি। (তুং আল ইয়াওমো আকমালতু লাকুম দীনুকুম/ আজ তোমাদের জন্য আমার ধর্মকে পূর্ণত্ব দান করলাম। (কু। মায়েদা-৫ঃ৩)।

কিন্তু বিভ্রান্ত মানুষ জাতি পরবর্তীকালে সে কথা ভুলে গিয়ে নিজেদেরকেই স্রষ্টার আসনে বসিয়ে দিল এবং স্রষ্টাকে করল অস্বীকার। ফলে একের বদলে বহু স্রষ্টার আবির্ভাব হল। প্রত্যেকেই স্বয়ম্ভু দাবি করল। তারই পরিণতিতে খোদাই ক্ষমতা নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে গেল। কবি নজরুল ইসলামের ভাষায়-

"তৌহীদ আর বহুত্ববাদে
বেধেছে আজিকে মহাসমর।
লা-শরিক এক হবে জয়ী
কহিছে আল্লাহ আকবর।
জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে
অন্ধকারের এ ভেদ জ্ঞান
অভেদ আহাদ মন্ত্রে টুটিবে
মানুষই হইবে এক সমান।
(দ্রঃ নজরুল ইসলামের মহাসমর কবিতা)।

আল্লাহ কয় জন?

তারই পরিণাম দেখা যাচ্ছে- দুনিয়াব্যাপী লড়াই- বসনীয়া, হার্জেগোভিনা, কাশ্মির, ফিলিস্তিন, রাশিয়া- চেচনিয়ায়। কবে সে মহাসমর সমাপ্তি হবে? আমিন। আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন।

**টীকা ঃ**

মুসলমানী- পুঁথি সাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে, আদিকালে মক্কাই সাধু এর প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ এখানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর কথা বলা হয়েছে। আম্মা হাযিরা এখানেই শিশু ইসমাঈলকে নিয়ে নির্বাসন জীবন যাপন করেন। আদি মানব জাতির উদ্ভব হয় বলে আল্লাহ কাবাগৃহকে বিশ্বমানবের জন্য কিবলা নির্ধারণ করেছেন। (পশ্চিম বা পূর্বের জন্য নয়)।

## পরিশিষ্ট-১

হযরত রসুল্লাহর কুরসীনামা/ নসবনামা

(২) তিনি আব্দুল্লাহর পুত্র।

(৩) আব্দুল্লাহ আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র

(৪) তাঁর পিতা - আবুল হাশিম,

(৫) " -আবদে মানাফ;

(৬) " -কুসাঈ;

(৭) " -কিলাব;

(৮) " -মুররা;

(৯) " -কা'ব;

(১০) " -লুয়াই;

(১১) " -গালিব

(১২) " -ফিহির;

(১৩) " -মালিক;

(১৪) " -নাদার;

(১৫) " -কিনানা;

(১৬) " -খুযাইমা;

(১৭) " -মুদরিকা;

(১৮) " -ইলিয়াস;

(১৯) " -মুদার;

(২০) " -নাযার;

(২১) " মা'আদ;

(২২) " -আদনান;

(২৩) " -উদ;

(২৪) " -মুকাওয়াস;

(২৫) " -নাহুর;

(২৬) " -তাইরাহ;

(২৭) " -ইয়ারুব;

(২৮) " -ইয়ামজুব;

(২৯) " -নাবিত;

(৩০) " -হযরত ইসমাঈল (আঃ);

(৩১) " - হযরত ইব্রাহীম (আঃ)।

উল্লেখ্য, হযরত ইব্রাহীম থেকে মিল্লাতে ইব্রাহীম/ ইব্রাহীমের মিল্লাত/ মন্ডলী বলা হয়। ইব্রাহীমকে এই কওম/ জাতির আদি -পিতা বলা হয়েছে (আবীকুম ইব্রাহীম/ তোমাদের আদি-পিতা ইব্রাহীম)।

খ্রীস্টান ও য়িহুদী ধর্মশাস্ত্রের বর্ণনা মতেও হযরত ইব্রাহীম আদি। তাঁর দুই পুত্র হযরত ইসহাক / Isaac, ও ইসমাঈল।

হযরত ইসহাক থেকে য়িহুদী ও খ্রীস্টান ধর্মের উৎপত্তি হয়। অন্য পুত্র ইসমাইলের বংশধরগণ জাজিরাতুল আরবকে কেন্দ্র করে বসবাস করতে থাকেন। তাঁরই বংশে শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর আবির্ভাব হয় (৫৭০-৬৩২ খ্রী)।

য়িহুদী -খ্রীস্টান নবীদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন- হযরত ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, মূসা, দাউদ, সুলায়মান, ঈসা প্রভৃতি। ঈসা হলেন এঁদের মধ্যে শেষ নবী। ঈসা নবীকে য়িহুদী-খ্রীস্টানগণ যিশু খ্রীষ্ট/ Jesus Christ বলে অভিহিত করেন।

আল-কুরআনে বর্ণিত রয়েছে হযরত মুহম্মদ শুধু শেষ নবীই নন-তিনি পিতা ইব্রাহীমের প্রিয় পুত্র ইসমাঈলের শেষ বংশধর এবং হযরত ইব্রাহীমের দু-আ/ প্রতিশ্রুতি মহানবী।

আদি পিতা হযরত আদমের বংশধরগণ/ নবীবংশ

(১) হযরত আদম (আঃ)

(২) হযরত শীছ;

(৩) হযরত ইয়াসিন;

(৪) হযরত কাইনান;

(৫) হযরত মাহলীল;

(৬) হযরত ইয়ারত;

(৭) হযরত ইদরিস;
(৮) হযরত আখিমুখ;
(৯) হযরত শালিখ;
(১০) হযরত লামক;
(১১) হযরত নূহ;
(১২) হযরত সাম;
(১৩) হযরত আরফাকশাস;
(১৪) হযরত শালিক;
(১৫) হযরত ওযায়ের;
(১৬) হযরত ফালেখ;
(১৭) হযরত রাউ;
(১৮) হযরত সারুগ;
(১৯) হযরত নাহুর;
(২০) হযরত তারেহ (আযর?)
(২১) হযরত ইব্রাহীম।

এই তালিকাটি হযরত ইবনে হিশাম থেকে দেওয়া গেল। উল্লেখ্য, লুক লিখিত সুসমাচারে প্রদত্ত তালিকাতেও এই তালিকার হুবহু মিল আছে। শুধু নামের বানানে সামান্য ব্যতিক্রম মাত্র। ম্যাথু লিখিত সুসমাচারে হযরত ইব্রাহীমের পূর্বের কোনো নাম নেই।

সুধী সমাজের অবগতির জন্য লুকের তালিকার পার্শ্বে ম্যাথুর তালিকাটি পেশ করা যাচ্ছে।

| লুকের তালিকা | | মথি/ম্যাথুর তালিকা | |
|---|---|---|---|
| (২১) | আব্রাহাম | (১) | আব্রাহাম (ইব্রাহীম) |
| (২২) | আইযাক (ইসহাক) | (২) | (আইযাক (ইসহাক) |
| (২৩) | য্যাকোব (ইয়াকুব) | (৩) | য্যাকব (ইয়াকুব) |
| (২৪) | যুদাহ | (৪) | যুদাহ |
| (২৫) | পেরেজ | (৫) | পেরেজ |
| (২৬) | হেযরণ | (৬) | হেযরন |
| (২৭) | আর্নি/ রাম | (৭) | রাম |
| (২৮) | আদমিন | (৮) | আম্মি নাদার |

| লুকের তালিকা | মথি/ম্যাথুর তালিকা |
|---|---|
| (২৯) আম্মিনাদার | (৯) নাহশোন |
| (৩০) নাহশোন | (১০) সলমন |
| (৩১) সল | (১১) বোয়াজ |
| (৩২) বোয়াজ | (১২) ওবেদ |
| (৩৩) ওবেদ | (১৩) যেছ্ছে |
| (৩৪) যেচ্ছে (যেছ্ছে) | (১৪) ডেভিড (দাউদ) |
| (৩৫) ডেভিড (দাউদ) | (১৫) সলোমন (সুলায়মান) |
| (৩৬) নাথান | (১৬) রহো বোয়াম |
| (৩৭) মাত্তাআ | (১৭) আবিজাহ |
| (৩৮) মেন্না | (১৮) আছা |
| (৩৯) মেলেয়া | (১৯) জেহো শাফতি |
| (৪০) এলিয়াকিম | (২০) জোরাম |
| (৪১) জোনাম | (২১) উজ্জাইয়া |
| (৪২) জোসেফ | (২২) জোথাম |
| (৪৩) জুদাহ | (২৩) আহাজ |
| (৪৪) সিমেঅন (সাইমেঅন) | (২৪) হেজেকিয়া |
| (৪৫) লেভী | (২৫) মানসসেহ |
| (৪৬) মাত্থতি | (২৬) আমোছ |
| (৪৭) জোরিম | (২৭) জোসিআহ |
| (৪৮) এলিরজের (Eliezer) | (২৮) জেকোনিআহ |
| (৪৯) জোসুয়া | (২৯) সেআলতিয়েল |
| (৫০) এর | (৩০) জেরুভাবেল |
| (৫১) এলমাদাম | (৩১) আবিউদ |
| (৫২) কোছাম | (৩২) এলিয়াকিম |
| (৫৩) আদ্দি | (৩৩) আজোর |
| (৫৪) মেলেহি | (৩৪) যাদোক |
| (৫৫) নেরি | (৩৫) আচিম |
| (৫৬) শোয়াল তিয়েল | (৩৬) এলিউদ |
| (৫৭) জেরুব্বাবেল (Zerubbabel) | (৩৭) এলিয়াজার |

| লুকের তালিকা | মথি/ম্যাথুর তালিকা |
|---|---|
| (৫৮) রেহ্ছা | (৩৮) মাত্থান |
| (৫৯) জেয়ানাম | (৩৯) জ্যাকোব |
| (৬০) জোদা | (৪০) জোসেফ |
| (৬১) জোসেফ | (৪১) জেসাস (হযরত ঈসা আঃ) |
| (৬২) সেমেইন | |
| (৬৩) মাত্তাথিয়াস | |
| (৬৪) মাআথ্ | |
| (৬৫) নাগ্গাই | |
| (৬৬) ইয়ালী | |
| (৬৭) নাহুম (Nahum) | |
| (৬৮) আমোছ | |
| (৬৯) মেত্তাথিয়াস | |
| (৭০) জোসেফ | |
| (৭১) জান্নাই | |
| (৭২) মেলেহি | |
| (৭৩) লেভি (Levi) | |
| (৭৪) মাথাত (Mattahat) | |
| (৭৫) হেলি | |
| (৭৬) জোসেফ | |
| (৭৭) জেসাস (Gesus) | |

হযরত ঈসার (Jesus Christ) পর শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (৫৭০-৬৩২ খ্রীঃ)।

আগেই বলা হয়েছে, হযরত ঈসা ইসরাইল বংশের শেষ নবী এবং হযরত মুহম্মদ ইসমাইল বংশের একমাত্র নবী এবং সমগ্র নবী বংশেরও শেষ নবী (খাতেমুন্নাবীঈন)।

এঁদের উভয়েরই আদি পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। ইব্রাহীমের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ), মাঝখানে হযরত নূহ (আঃ)। বাইবেলে 'নোয়া' এবং হিন্দু মতে মুন।

হিন্দু মতে, মুন থেকে মানব (মুন> মানব) জাতির উদ্ভব। মনুর উপর

'মনুসংহিতা'/ ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়। (Code of Manu)। মনু-ইব্রাহীম মুসা- ঈসা ও মুহম্মদ-এ এসে কলি/কল্কির যুগ শুরু হয়। কল্কির পরেও কোন অবতার নেই। পৌত্তলিক ভারত মনে করে কলিতে ভগবান কৃষ্ণ 'জগন্নাথ' নামে সশরীরে আবির্ভূত হন।

তাই মানব জাতিকে একই জাতি, এবং তার আদি পিতা একটি (১) আদম (২) নূহ (৩) ইব্রাহীম প্রভৃতি এবং তাঁরা এক ভ্রাতৃ সমাজ। আরও উল্লেখ্য, লুকের তালিকায় দাউদের পর সুলায়মান আছে। বিখ্যাত নবী হযরত মূসা/ মোজেছ নাম উভয় তালিকাতেই অনুপস্থিত। মথির তালিকায় 'রাম' নামে একজন নবীর নাম আছে। লুকের তালিকায় আবার নামটি নেই। বিখ্যাত বাল্মিকী রামায়নে 'নরোত্তম' 'রামের বর্ণনা' আছে। সংক্ষেপে হযরত আদম থেকে ইব্রাহীম পর্যন্ত ২১টি এবং ইব্রাহীম থেকে মথির তালিকায় পাচ্ছি মোট ৪১টি নাম। লুকের তালিকায় আছে ৭৭টি নাম। এদের আনুমানিক কাল নির্ণীত হয়েছে-

হাবুতি সন (খ্রীস্টপূর্ব) ৪০০৪ সাল। (খ্রীস্ট পূর্ব)।

হিব্রু বাইবেল মতে, রসুলুল্লাহর নবুয়ত পর্যন্ত ৫৯৯২ বৎসর অনুমিত হয়। এর সঙ্গে খ্রীস্টীয় সন ধরলে বর্তমান কাল অবধি হয় ৫৯৯২+১৩৫৯ = ৭,৩৫১ ব ৎসর।

তালিকাটি মনীষী মি. মরিস বুকাই (Bucaily)- এর গ্রন্থেও মিলছে।

ইসলাম শাস্ত্র- সূত্রে পাওয়া যায়-

## নবীগণের জন্ম তালিকা ও আয়ু

হযরত আদম (আঃ) হইতে হযরত মোহাম্মদের (সাঃ) হিজরত পর্যন্ত নবীগণের জন্ম তারিখ। মুসলিম ঐতিহাসিক তবরী এবনে খলদুন হইতে গৃহীত ও তওরাত দ্বারা সমর্থিত।

হবুতি সনঃ- হজরত আদমের (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণের বৎসরকে হবুতি সন বলা হয়।

| | |
|---|---|
| (১) হযরত আদমের পৃথিবীতে অবতরণ | হবুতি-১ সন |
| (২) হযরম শীশের (আঃ) জন্ম | হবুতি -১৩০ সন |
| (৩) হযরত নূহ (আঃ) জন্ম | হবুতি- ১০৫৬ সন |
| (৪) হযরত শাম (আঃ) জন্ম | হবুতি- ১৫৫৬ সন |

তাঁর নাম হতে শাম (সিরিয়া) রাজ্যের নামকরণ হয়েছে।

(৫) হযরত ইব্রাহিম (আঃ) জন্ম হবুতি- ১৯৮৭ সন

(৬) হযরত ইছহাক (আঃ) জন্ম হবুতি -২০৮৭ সন

(৭) হযরত ইয়াকুব (আঃ) জন্ম হবুতি- ২১৪৭ সন

তাঁর পুত্র হজরত ইউসুফ (আঃ) ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

(৮) হযরত মুসা (আঃ) জন্ম হবুতি -২৪১২ সন

(৯) হযরত দাউদ (আঃ) জন্ম হবুতি -৩১০৯ সন

(১০) হযরত সোলায়মান (আঃ) জন্ম হবুতি -৩১৪৯ সন

(১১) হযরত ঈসা (আঃ) জন্ম হবুতি -৪০০৪ সন

হিব্রু বাইবেল অনুসারে হযরত মোহাম্মদের (সাঃ) হিজরত পর্যন্ত ৫৯৯২ বৎসর গণনা করা হয় ও পারসিকদের মতে ৪১৮০ বৎসর গণনা করা হয়।

## নবীগণের আয়ু

হযরত আদম (আঃ) ৯৩০ বৎসর

হযরত শীশ (আঃ) ৯১২ বৎসর

হযরত নূহ (আঃ) ১৪০০ বৎসর

হযরত হুদ (আঃ) ৪৬৪ বৎসর

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ১৩৫ বৎসর

হযরত ইয়াকুব (আঃ) ১৪৭ বৎসর

হযরত ইউছুফ (আঃ) ১০০ বৎসর

হযরত আয়ুব (আঃ) ১৪০০ বৎসর

হযরত মুসা (আঃ) ১২০০ বৎসর

হযরত ইউসা (আঃ) ১১০ বৎসর

হযরত দাউদ (আঃ) ৭০ বৎসর

হযরত ঈসা (আঃ) ৩৩ বৎসর

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ৬৩ বৎসর।

[নেয়ামুল কুরআন। মোহাম্মদ শামসুল হুদা]

অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানব জাতির একটি আনুমানিক কাল নির্ণীত হল। এবং বলাবাহুল্য, এই তালিকা মেনে নিলে মানব জাতির একত্ব ও আল্লাহতায়ালার প্রভুত্ব (নবুবিয়ত) মেনে নিতে বাধা থাকে না। আল কুরআনেও পাই-

হে মানব জাতি, নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক প্রভু এক, আর নিশ্চিয়ই তোমাদের পিতা এক। তোমরা সকলেই আদমের সন্তান এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত যে সকলের চেয়ে ধর্মপরায়ণ।" [আল্ হাদিস বিদায় হজ্জের বাণী]

## শেষ নবী রসূলুল্লাহর কুরসীনামা/ বংশ লতিকা

১) হযরত মুহম্মদ;

পিতা ২) আবদুল্লাহ;

" ৩) আব্দুল মুত্তালিব;

" ৪) আবুর হাশিম;

" ৫) আবদে মানাফ;

" ৬) কুসাঈ;

" ৭) কিলাব;

" ৮) কা'ব;

" ৯) লুই;

" ১০) গালিব;

" ১১) ফাহর (কুরাইশ)'

" ১৩) মালিক;

" ১৪) নাযর;

" ১৫) কিনান;

" ১৬) মুদরিকা;

" ১৭) খুজারমা;

" ১৮) মুদরিকা;

" ১৯) ইলিয়াস;

" ২০) মুদার;

" ২১) নায্যার;

" ২২) মাআদ;

" ২৩) আদনান;

" ২৪) এর পরে হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ পর্যন্ত।

# আলোক চিত্রের মূল পাঠ

A Zabardast Challenge with a reward of Rs.1000/-

To the Arya-Samajists and the Idolatrous-Militant Hindus

And a shower of God's bessings upon the Truth seeking One's.

Now that the time is gliding fast forwards the Moha-Pralaya and the Doom's Day, the Great Karunamaya God's unbounded Mercy showered upon the people, and the exposition of some of the Mantras of the Mohamoni vedas and the purans has been made possible throwing a clean flood of Light to almost all the life incidents of the only Jagat-Guru, the Mighty Mokshya-Data (Saviour) of the whole world thus:-

1. His name was to be Muhammad (s). his father's name Abdullah a Brahman decent, He was to born as prayed for by Brohma and in the month of Baisakh (Suklapakshya Dwadoshi Tithi) in the desert of Arabia, in the city of Mecca, where the Moha pita Brohma and his eldest Atharva did pass the Ordeal of God's prem in the purusa-Medha; and both built the Holy-Caaba, the Beitullah (House of God), the Heaven's Amritabrita and the angels' Ajeya-puri.

2. He was to be brought up by Mohashosthi Dhatri Mata (Halima) and remain an orphan in boyhood.

3. He had to retire to a Cave (Hera) and taught Jnan (Quraan) by the angel of God.

4. He was to be acutely persecuted by his uncle kalidas and other infidels of Mecca and obliged by Order of God to migrate to Medina making to a Tirthasthan.

5. At Medina he was to defend his religion Islam and win all battles against the Mlechhas. In the Battle of Ḱhandak with the help of Brihaspoti he was to defeat the Confederate hosts of 10000 infidels who were to attack Medina, and then he was to conquer the forts of treacherous Jews, and punish them suitably.

6. From medina he was to march with 10000 of his saints to Conquer Mecca and after its conquest he was to declare a general amnesty to all the Mecca infidels who had so long been the fatal enemies of Jagat Guru after crashing him with his religion Islam, and that it was to be his great act of benevolence of a Bir conqueror.

7.He was predicted to possess camels as his Bahon, and also twenty

milch camels and he was to be awarded four classes of companions as have been clearly mentioned in the Veda.

8. His Islam was to be the Sarbottoma Religion and it was to be spread in india through Mohammad bin Quasem who was to appear upon the Sindhu river and that Islam was to make Shuddhi of the Arya dharma.

9. Muhammad(s)'s preaching was to be after the direction of the Holy Quraan which was to be the only Suitable Boat consisting of the most beautiful planls (Suras of chapters) for Crossing this Bhabo-Sagar and it was to be such a perfect Boat (the code of Law) that it would admit of no water into it (no replacement of amendment of it would be quotable and the Sure Boat for the Poritran of the people, and many other incidents."

The learned and truthful pundits are aware that the Vedas do not teach either the worship of the Lord God by means of Idols, or the faith of the punarjanma (transmigration of souls), which are both false, being emanated from the elcutly brains of frail minds; and the great Veda-Vyasa (Krishna Doipayan Muni, the introducer of the Idol worship himself prayed to God for being pardoned for his such sinful actin.

Nothing against the Vedic Creed should be entertained by a Dharmatma. When the Param-Pata Himself is the Creator, the Sustainer and the Destroyer (Laya-Karta), the belief in the punarjanma cannot come, or stand crumbling down suomotu. Can the high cast Hindus discard the Vedas or the Shudras the Purans? No; because those are the only means of their Mokshya, and any flagrant transgression of them will entail eternal damnation. Of all aims (political etc) the aim if Mukti (Salvation) must stand superior. of course Islam vouchsafes the success of all aims.

No suitable piety can exist when it is not founded on conviction, which everyone must possess of his own religion and conviction can not be acquired expect by investigation or by methodical catechism.

Therefore I offer myself to make the exposition of the said Mantras on the light of the above noted truths. Will the learned Pundits, especially the Hindu Judges and Lawyers and professors, as also the intelligent Students, and other Truth-seekers take the opportunity of hearing me in great gatherings? Any rectification will be highly appreciated and acknowledged and embodied in my book "Oishi-Bijnan"

and "God's Beacon Light for the World's Religious Mariners" (Bengali and English editions), to be proved most benificial for the learned Moulvies, Pandits, Padries and other Teachers of men in general.

A full refutation of my truths will fetch a reward of Rs. 1000/. for any body from me.

I am, a servant of all Truth-Seekers
Haji Md. Serajuddin
Mohaqqeque Maldahi
Late Inspector of Police (Bengla, C.I.D)
Now, of the Mohammadi, C.I.D.

My Address: Haji Md. Serajuddin
P.o & Dist, Malda (Bengal)
Tele: Address:- Haji Serajuddin
MALDA

P.S. I am available to all Truth seekers anywhere
For state communication better use Reg. Letters.
11.11.44

the Fine Art Rress- BOGRA.

# সহায়িকা গ্রন্থ-পঞ্জী

১. শ্রী মদ্ভাগবত গীতা;

২. বাইবেল ( পুরাতন ও নতুন নিয়ম);

৩. কুরআন শরীফ

৪. বাল্মিকী রামায়ন (সংস্কৃত)
(রামায়ণ)
সংস্কৃত মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত
ভট্টপল্লীনিবাসি পন্ডিত প্রবর শ্রী পঞ্চানন তর্করত্ন
সম্পাদিত
৪র্থ সং, কলিকাতা- সম ১৩১৫ সাল]

৫. বাইবেল কুরান ও বিজ্ঞান- (মরিস বুকাই অনূদিত)
(Teh Coran, The Bible and Science Mourice Bucaily)

৬. বেদ ও পুরাণে হযরত মোহাম্মদ (দঃ)। বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় বিরচিত।
(অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত
মাদ্রাসা পাবলিকেশন সেন্টার
৩৪ কলিন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৬
১ম সং ১৯৭৮]

৭. মহাভারত। বাংলা গদ্যানুবাদ- কালীপ্রসন্ন সিংহ।

৮. কল্কি পুরাণ। শব্দ কল্পদ্রুম। ২য় কান্ড। রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রণীত।
কলিকাতা, ১৯৩১ সং বৎ।

৯. শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ। মুহম্মদ সফীয়্যুল্লাহ সম্পাদিত। ঢাকা, ১৯৮৭

১০. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থ। মুহম্মদ আবু তালিব সম্পাদিত।
ই-ফা-ঢাক, ১৯৯০।

১১. নবী করীম হযরত মুহম্মদ (দঃ)।

১২. সৈয়দ সুলতানের নবী বংশ। ডক্টর আহমদ শরীফ সম্পাদিত। বা/এ,
প্রকাশিত ঢাকা।

১৩. দেব-কাহিনী। সফিউদ্দীন আহমদ। কলিকাতা, ১৩২৪/১৯১৭।

১৪. আধুনিক বিজ্ঞানঃ ইতিহাস ও কুরআন।
অধ্যাপক আবদুস সোবহান। ই-ফা-বা, ঢাকা, ১৯৮৬।

১৫. লালন শাহ ও লালন-গীতিকা (১-২)। বা-এ- ঢা, ১৯৬৮।

১৬. জালাল উদ্দীন রূমী ও তাঁর সুফীতত্ত্ব। ডক্টর হরেন্দ্র চন্দ্র পাল (১ম ও ২য় খন্ড)। কলিকাতা, ১৯৮৫ ও ৮৮।

Jalal Uddin Rumi and his Islamic Mysticism Part I & II (The Epilogue). Calcutta, 1985-88.

১৭. ইসলামী বিশ্বকোষ। ই-ফা-বা, ঢাকা, ১ম-৪র্থ খন্ড। - ১৯৮৮।

১৮. Jewish Encyclopaedia, New York, 1961.

১৯. Paunacock, (?), Analysis of Scripture, History. Cambridge.

২০. Gospel of Barnobos.

২১. ইরান ও ইসলাম। ডক্টর গোলাম মকসূদ হিলালী। (অনুবাদ মুহম্মদ মমতাজ উদ্দীন)। বা/এ, ঢাকা।

২২. ছাত্র বোধ অভিধান। আসুতোষ দেব। কলিকাতা, ১৯৬৯।

**শব্দ-সংকেৎ ঃ**

বা.-বাংলা,

ইং-ইংরাজি,

ফা. -ফারসী,

পা. -পাহলভী,

হি. -হিব্রু, ইবরানী,

সং-সংস্কৃত,

ল্যা- ল্যাটিন।

রহ- রহমাতুল্লাহ আলাইহে, রাহমাতুল্লিল আলামীন

স. -সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম।

# লেখক পরিচিতি

## মুহম্মদ আবূ তালিব

জন্মঃ ১ এপ্রিল, ১৯২৮/১৮ বোশেখ, ১৩৩৫ বাং
গোয়ালখালি, মুজগুন্নি, খুলনা (পৌর কর্পোরেশন),
সহযোগী অধ্যাপক (অব.) বাংলা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।
বি.এ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৮;
এম.এ, বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২;
সাহিত্য ভারতী, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত ১৩৫৫/১৯৪৮,
বিশেষ সনদ, আধুনিক ফারসী ভাষা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৫।

**সম্মাননা ঃ**

আন্তর্জাতিক অনারারী সদস্য, International Biographical
Centre/ I.B.C.
Cambridge, England

American Biographical Institute/ Abi, USA

International Man of the year, towards Educatoin, I.BC. 1991

Five Hundred Leadar Influence: A Celebration of Global Achievement, 1991. U.S.A

The First Five Hundred (Gold Medalist), 1991

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি (ভারতীয় ভাষা) সদস্য পরিষদ।

স্থায়ী সদস্যঃ এসিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ ঢাকা, শাহগরীবুল্লাহ সাহিত্য স্মৃতি পুরস্কার, হাওড়া, পশ্চিম বঙ্গ।

বাংলা সাহিত্য পরিষদ (ঢাকা), ১৯৯১/১৩৯৮

খুলনা সাহিত্য পরিষদ (আব্দুল জলিল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২);

যশোর আব্দুর রশীদ সাহিত্য পরিষদ, (১৯৮৯);

হিলালী সাহিত্য পুরস্কার, রাজশাহী, (১৯৮৯);

মধুসূদন সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯০);

উত্তরা সাহিত্য মজলিস পুরস্কার (১৯৮১);

সংবর্ধনা কারমাইকেল কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সমিতি, (ঢাকা), (১৯৯১);

বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী, সম্মাননা সনদ (১৯৯৬);

লালন পুরস্কার, ঢাকা (১৯৯৭);

বিশিস্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, গবেষকঃ প্রত্নতত্ত্ববিদ লোকবিদ্যাবিদ, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও সাহিত্যবিদ।

## রচনাবলী ঃ

গ্রন্থ সংখ্যা অর্ধশতাধিক

বিষয় ঃ বিচিত্র (বাংলা ও ইংরাজি)

**উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ**

লালন শাহ ও লালন-গীতিকা (১-২) বা-এ-ঢা, ১৯৬৮;

বাংলা সাহিত্যের ধারা (প্রচীন ও মধ্যযুগ)- ঢাকা, ১৯৬৮;

বিস্মৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায়, বা-বু-ক, ঢাকা, ১৯৬৮;

মজনু শাহ (১৯৬৯);

শাহমখদুম রূপোশ (রঃ) ১৯৬৯);

উত্তর বঙ্গে সাহিত্য সাধনা, রাজ, ১৯৭৫;

বাংলা সাহিত্যের একটি হারানো ধারা, ই-কা-বা, ঢা, ১৯৮৫;

মুনশী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ (ই-ফা-বা, ঢা, ১৯৮৩);

বাংলা কাব্যে ইসলামী রেনেসাঁ, ১৯৮৪;

বাংলা সনের জন্ম কথা, বা-এ, ঢা, ১৯৭৭;

নবাব ফয়জুন্নেসা (ঢাকা, ১৯৮৫);

উপেক্ষিত সাহিত্য সাধকঃ সাতজন (ই-ফা-বা, খু ১৯৮০);

ভাষা, সাহিত্য ও লিপি। সৃজন ঢা, ১৯৯১;

মানব জাতির সপক্ষে, মুসলিম সাহিত্য সমাজ, ঢাকা, ১৯৯১;

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শতবর্ষ পূর্তি স্মারক গ্রন্থ। ই-ফা-বা, ঢা, ১৯৯০;

রামমোহন রায়ের তুহফা/ উপহার

বাংলা অনুবাদ সম্পাদনা, কলি, ১৯৯৫;

খুলনা জেলায় ইসলাম (ই-ফা-বা, ঢা. ১৯৮৮)

যশোর জেলায় ইসলাম (-১৯৯১)

পাবনায় ইসলাম (-১৯৯৫)

ইংরেজী ঃ Bengali in Bangladesh, CAS vol XI,

Netherlands, 1978

The First Capital of Muslim Rule in Bengal.

The Morning News, Dhaka. 1975

কবি মোহাম্মদ গোলাম হোসেন। বা-এ, ঢাকা,

বঙ্গদেশীয় হিন্দু-মুসলমান। গোলাম হোসেন বিরচিত, সম্পাদিত।

ই-ফা-বা, ঢাকা, ১৯৯৬।

মানব জাতির সপক্ষে। ঢাকা ১৯৯১।

কবি মোহাম্মদ গোলাম হোসেন ঃ আত্মজীবনী ও সাহিত্য সাধনা।

ই-ফা-বা, ঢাকা ১৯৯৭ -ইত্যাদি।